এপ্রিল ১৯৮৮

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ভেষজ উদ্ভিদ

আমাদের ভেষজ উদ্ভিদ : সীমা সেন

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত
গ্রন্থতালিকা—৮০-৮১-৮২, ৮৩-৮৪

অন্নদাশঙ্কর রায়	লালন ও তাঁর গান	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বনে জঙ্গলে	১৫·০০
সমরজিৎ কর	কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান	২১·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	হট্টমালার দেশে	৮·০০
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য	পশু পাখী কীটপতঙ্গ	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	রোবোট এল কেমন করে	৮·০০
সুনির্মল বসু	রোমাঞ্চের দেশে	৬·০০
সমরজিৎ কর	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	২০·০০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	চিৎপুর চরিত্র	২৫·০০
শীতাংশু মৈত্র	যুগন্ধর মধুসূদন	১৫·০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভেপান্তর	২০·০০
অমরনাথ রায়	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোঃ সন্দীপন পাঠশালা	১০·০০
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর গোয়েন্দা গল্প	১০·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর রহস্য গল্প	৮·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঘনাদা বিচিত্রা	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপুর ছেলেবেলা	১০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কিশোর অপু	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোটদের অপরাজিত	১০·০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছোটদের কাশীনাথ	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পশুপক্ষী	২০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বাঙলার ডাকাত (১-৪)	৩২·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	খুকুমণির ছড়া	১০·০০

সাহিত্য সংগ্রহ ও
বিবিধ প্রবন্ধ.....

অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বাধীনতার
পূর্বাভাস ১৫

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
চিৎপুর চরিত্র ২৫

অনন্ত সিংহ
কেউ বলে
বিপ্লবী কেউ
বলে ডাকাত ২০

মনি বাগচি
সপার্ষদ
শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুনশী রামরাম
বসু ২০

শীতাংশু মৈত্র
যুগন্ধর মধুসূদন
১৫

রমাপদ চৌধুরী
আমরা সবাই ১০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত
পুরাতন গদ্যগ্রন্থ
সঙ্কলন
১ম ও২য় খণ্ড ৩৫

বিজ্ঞাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ
বিনোদিনী ২০

বিপিনবিহারী গুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ
৩০

শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
কথামৃত ২৫

উপন্যাস
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষেরসত্যাসত্য
৩০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
থমকে কেন
দাঁড়িয়ে ১০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কখনো সম্রাজ্ঞী ৮

অমিত রায়
দুই রমনীরগপ্পো১০

সুকুমার ভট্টাচার্য
সবাই মিলে ৬

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড.
কল-৯

ছবি. ছড়া ও গল্পের
বই

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খেলার সাথী [illegible]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথামালার গল্প
৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার
কুট্টিমামা ৪·০০

ধীরেন বল
ঠেকে হাবুল শেখে
৫·০০

দেবাশীষ বসু
বাঘ সাপ হাতি [illegible]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মনোহর ডাকাত [illegible]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কচিমুখের ছড়া [illegible]

দক্ষিণারঞ্জন বসু
ঠাকুমার ঝুলি [illegible]
ঠাকুরদাদার ঝোলা
১০·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছোটদের রামায়ণ
১০·০০
ছোটদের মহাভারত
১০·০০

মনি বাগচি
অমর চরিত কথা [illegible]

অখিল নিয়োগী
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান
১০·০০

তপনায়ন ঘোষ
ডেড় লাইন
৩১ অক্টোবর ১০·০০

হাননান আহসান
স্পোর্টস ক্যুইজ ১৮·০০
রঞ্জন সক্রাসিক্স কমিকস
অগ্নিগিরির গুপ্তধন
৩·০০
শেষ বিজয় ৩·০০
কলঙ্কিত ছোরা ৩·০০
মুক্তিযোদ্ধা ৩·০০
মৃত্যু মাতাল অরণ্য
৩·০০
সাগর শয়তান ৩·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
এপ্রিল : 1988

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : পেঙ্গুইনের কৃত্রিম রাজ্যে ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : অরণ্যের আত্মা ॥ নিরঞ্জন সিংহ 31

পড়াশোনা : অক্সিজেন ॥ অমরনাথ রায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : আমাদের ভেষজ উদ্ভিদ ॥ সীমা সেন 19

কমপিউটারের কলাকৌশল : কম্পিউটার তৈরি হবার গল্প ॥ সৌম্য মিত্র 17

জীবজন্তু : গুংগা ॥ তপন আদক 22 : নিষ্ঠুর পাখি ॥ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত 41 : ডায়নোসর ॥ ঋণা রাজন 39

ধারাবাহিক রচনা : মানুষ-মশাল রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন 47 : নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 35 : বিজ্ঞানের ডায়েরী ॥ বিমান বসু 10

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা : ইলেকট্রনিক্স কুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 16 : ভোল্টেজ রেগুলেটরের গোড়ার কথা ॥ সৌমেন চক্রবর্তী 28

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : রামব্রহ্ম সান্যাল ॥ অজয় হোম 15

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা : অ্যালার্জি কি এবং কেন ? ॥ জয়ন্তকুমার রায় 27 : কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি নয় ॥ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় 53

সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস : জলঘড়ি ॥ অপরাজিত বসু 65

খেলাধুলা : খেলাধুলার টুকিটাকি ॥ অজয় দাশগুপ্ত 54

ফিচার ও ছবিতে গল্প : প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 : আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 12 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 14 : চেনা অচেনা 55 : কুইজ কনটেস্ট 56 : শব্দকূট 57 : আবিষ্কারের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 58 : বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : বলতে পারো কেন ? ॥ সুধাংশু পাত্র 63 : নিজে নিজে কর : মিডিয়াম ওয়েভ পকেট রেডিও ॥ সুভাশিস ঘোষ 66 : সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 : বিজ্ঞান সমাবেশ 62

প্রতিযোগিতামূলক রচনা : প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত ॥ অরুণাভ সোম 6 : মহাকাশ গবেষণায় ভারত ॥ অভিজিৎ সরকার 34 : কুসংস্কার ॥ মৌসুমী দত্ত 38 : ভৌতিক কাণ্ড ও বিজ্ঞান ॥ সুজাতা চট্টোপাধ্যায় 52

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল **অন্যান্য ছবি :** অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতীয় ডাক টিকিটে বিজ্ঞানী

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

চিঠিপত্র

'বলতে পারো কেন' বিভাগে পাঠকের প্রশ্ন

আমি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক, গত ফেব্রুয়ারী '৪৪ সংখ্যায় 'বলতে পারো কেন ?' বিভাগে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করলাম, তা জানাবার চেষ্টা করছি ।

i) অ্যাকোয়া রিজিয়া কি ? এই প্রশ্নের উত্তরের শেষে দেখলাম যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা জারিত হয়ে ক্লোরিন উৎপন্ন করে । কিন্তু এখানে শুধু ক্লোরিন হবে না, হবে জায়মান ক্লোরিন, কারণ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড 3:1 আয়তন অনুপাতে মেশালে জায়মান ক্লোরিন উৎপন্ন হয় যা অনেক বর ধাতু (Noblemetals) যেমন গোল্ড, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুকে তাদের ধাতব ক্লোরাইড উৎপন্নের মাধ্যমে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে ।

$3HCl + Hno3 = Nocl + 2 [cl] + 2H_2O$

$Au + 3 [cl] = Aucl3$ (অরিক ক্লোরাইড)

$Aucl_3 + Hcl = HAucl_4$
(ক্লোরঅরিক অ্যাসিড)

$Pt + 4 [cl] = Ptcl_4$

$Ptcl_4 + 2Hcl = H_2Ptcl_6$
(ক্লোরপ্লাটিনিক অ্যাসিড)

ii) B. M. R এর পুরো নাম-কি ? উত্তর দেওয়া হয়েছে Base Metabolic Rate । কিন্তু B. M. R এর পুরো নাম Besal Metabolic Rate বাংলায় অর্থ মৌল বিপাক হার ।

iii) Mno_2-কে ম্যাঙ্গানীজ ডাই অক্সাইড বলা হয় কিন্তু BaO_2 কে বেরিয়াম পারঅক্সাইড বলা হয় কেন ? BaO_2 তে স্বাভাবিক অক্সাইড অপেক্ষা এক পরমাণু অক্সিজেন অধিক থাকে । কিন্তু অতিরিক্ত অক্সাইড যুক্ত থাকলেই যে পার অক্সাইড হবে এমন কিন্তু নয়, অক্সিজেন পরমাণু দুটি 'পারক্সো বন্ধনী (Peroxo Linkage) [—o—o—] দ্বারা যুক্ত হতে হবে এবং লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2O_2 (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড) উৎপন্ন করতে হবে । BaO_2 তে পারক্সো বন্ধনী আছে এবং উহা লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করতে পারে ।

BaO_2 $\left(Ba \begin{smallmatrix} O \\ | \\ O \end{smallmatrix}\right)$ BaO_2 +

$H_2SO_4 = BaSO_4 + H_2O_2$

আপনাদের পত্রিকার এই 'বলতে পারো কেন' ? বিভাগটি আমার দারুণ লাগে । আপনাদের পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ।

তপোব্রত মিত্র, বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয়

আমি একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী । ফেব্রুয়ারী '৪৪ সংখ্যার 59 পাতায় শ্রদ্ধেয় সুধাংশু পাত্র মহাশয়ের প্রদত্ত 'অ্যাকোয়া রিজিয়া'—র সংজ্ঞায় উৎপন্ন ক্লোরিনকে cl_2 হিসাবে লেখা ও বলা আছে । কিন্তু 'সুখেন্দু মাইতি'— মহোদয়ের 'মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান'—(×)—এর 165 পাতায় উক্ত উৎপন্ন ক্লোরিনকে জায়মান ক্লোরিন বলা হয়েছে ও সংকেত হিসাবে লেখা হয়েছে —2cl । আপনার পত্রিকা মারফৎ কোন্ সমীকরণটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক তা জানতে পারলে বিশেষ বাধিত হই,—

অশোক কুমার মাহাতো
চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল, পুরুলিয়া

আমি এই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত ও আগ্রহশীল পাঠক । গত ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'বলতে পারো কেন ?' বিভাগে পিনাকী অধিকারীর 'অ্যাকোয়া রিজিয়া কি ?' প্রশ্নের উত্তরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে Hcl HNO_3 দ্বারা জারিত হয়ে ক্লোরিন উৎপন্ন করে এবং সমীকরণ দেওয়া হয়েছে $3Hcl + HNO_3 = cl_2 + NOcl + 2H_2O$ কিন্তু, অম্লরাজে ঐ দুই এ্যাসিড বিক্রিয়া করে জায়মান ক্লোরিন উৎপন্ন করে, যা পারমাণবিক অবস্থায় থাকে এবং সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতিকে দ্রবীভূত করে । সেজন্য সমীকরণ হবে $3Hcl + HNO_3 = 2cl + NOcl = 2H_2O$.

আবার, লক্ষ্মীকান্ত বোসে'র ফেলসপার বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'ইহা একটি পাথরবিশেষ এবং সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের অ্যালুমিনো সিলিকেট' । ইহার সঙ্কেত দেওয়া যায় না । কিন্তু হবে ফেলসপার অ্যালুমিনিয়াম, পটাসিয়াম ও সিলিকনের একটি যৌগ এবং ইহার সঙ্কেত হল $[K_2O, Al_2O_3, 6SiO_2]$ সোডিয়াম এর সঙ্গে সম্পর্কহীন ।

শুভাশিস চ্যাটার্জী, চণ্ডীতলা, হুগলী

গত Dec. '87 সংখ্যাটি পড়তে আমার একটু দেরী হয়ে যায় । ঐ সংখ্যার "বলতে পারো কেন ?" বিভাগের 65 পৃঃ 6নং প্রশ্নটি ছিল "পৃথিবীর আয়তন ও ওজন কত ?" এর উত্তরে সুধাংশুবাবু জানিয়েছেন "ভূপৃষ্ঠের আয়তন 1969, 50,000 বর্গমাইল এবং ওজন 66 কোটি টন" । আমার প্রশ্ন "তা কিভাবে সম্ভব ?" নিম্নে আমি আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করলাম :—

প্রথমতঃ—প্রথমে "পৃথিবীর আয়তন প্রসঙ্গে আসা যাক। পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের (oblate Spheroid) ন্যায়। মেরু ব্যাস (12714Km) ও নিরক্ষীয় ব্যাস (12757 Km)এর গড় করলে গড় ব্যাস হয় 12735·5 Km গণনার সুবিধার জন্য ধরা হয় 12800Km। সে অনুসারে ব্যাসার্ধ ধরা হয় 6400Km পৃথিবীর আয়তন বলতে শুধু ভূপৃষ্ঠের আয়তন (?) কেই বুঝায় না; বুঝায় এর অভ্যন্তরের সমস্ত পদার্থের আয়তনও। অতএব গোলাকৃতি হিসাবে ধরলে পৃথিবীর আয়তন $109952 \times 10_{6}$ ঘন মি. ($\frac{4}{3}\pi r^3$ অনুসারে) ∴ প্রথম অংশের আলোচনায় আমাদের কাছে তিনটি ভুল ধরা পড়ে —

(1) পৃথিবীর আয়তনের স্থলে ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া হয়েছে;

(2) ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে "আয়তন" অপেক্ষা "ক্ষেত্রফল" বলাই উচিত।

(3) পৃথিবীর আয়তন নির্দেশক সংখ্যাটি এবং এককও ভুল হয়েছে। আয়তনের একক কি কখনও বর্গমাইল হতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ—এবার আসা যাক "পৃথিবীর ওজন" প্রসঙ্গে। সুধাংশুবাবু বলেছেন ("ভূপৃষ্ঠের) ওজন 66 কোটি টন। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার; চাওয়া হয়েছে "পৃথিবীর ওজন কত?" অথচ উনি উত্তর দিয়েছেন "ভূপৃষ্ঠের ওজন" সম্পর্কে। পৃথিবী বলতে কি শুধু ভূপৃষ্ঠকেই বুঝায়? পৃথিবীর ওজন মোটেই 66 কোটি টন নয়। 1984-85 সালের হিসাব মতে শুধু ভারতের সঞ্চিত খনিজের মোট ওজন প্রায় 10800 কোটি টন। তা হলে অন্যান্য দেশের ভূগর্ভে সঞ্চিত খনিজের ওজন যে ঋণাত্মক হয়ে যায়! বৃটিশ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্ডিশ 1797 খ্রীঃ পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তি ও ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর যে ওজনের হিসাব করেছিলেন সেই হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ওজন $5,697 \times 10^{18}$ টন।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথায় উপনীত হওয়া যায় যে সুধাংশুবাবুর উত্তরে কয়েকটি ভুল আছে পরিশেষে বলি যে "বলতে পারো কেন?" বিভাগটি খুবই আকর্ষণীয়।

বিপ্লব মন্ডল, হাবড়া হাই স্কুল, দশম—ক—1

প্রসঙ্গ : চা পানের প্রয়োজনীয়তা

ফেব্রুয়ারী '88 সংখ্যায় 'বলতে পার কেন?' বিভাগে মাননীয় সুধাংশু পাত্র মহাশয় চা খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুধুমাত্র চায়ের ফ্লোরাইড উপাদানের কথা বলেছেন। কিন্তু সুধাংশুবাবু ভুলবশতঃ চায়ের অন্যতম প্রধান উপাদান 'কেফিন' (Caffine, $C_8H_{10}O_2N_4$) নামক অ্যালকালয়েড-এর কথা একবারও উল্লেখ করেননি। কারণ প্রতি কাপ চা' পানে আমাদের শরীরে 50-100 মিলিগ্রাম কেফিন প্রবেশ করে। যা কিনা আমাদের নার্ভতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে কাজের দক্ষতা বাড়ায়। তাছাড়া চায়ে অন্যতম উপাদান 'ট্যানিন' ও 'ফ্যাটিসিন' নামক অ্যালকালয়েড ও বর্তমান থাকে। যারা আমাদের শরীরে ঢুকে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে মানসিক ও শারীরিক পারদর্শিতা বাড়ায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অত্যধিক পরিমাণ চা গ্রহণ করলে এই সমস্ত অ্যালকালয়েড নানা উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন অনিদ্রা, খিদে কমে যাওয়া, হৃদপিণ্ডের দ্রুততর ও অনিয়মিত ক্রিয়া, হাতে পায়ে কাঁপুনি এছাড়া নার্ভগুলিকে অবসাদগ্রস্থ করে মস্তিষ্কের দারুণ ক্ষতি করতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, জয়রামপুর শংকদেবপুর 24পরগনা-743503

দিনকানা

গত ডিসেম্বর' 87 সংখ্যার শরীর-স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিভাগের 'দিনকানা' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম এবং এখানে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করছি।

প্রাণিজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে সবকটি বর্ণ বা রং সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পায়। এর কারণ মানুষের অক্ষির রেটিনার রড্ ও কোন্ কোষের সংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত। এটা প্রায় 1:18. উল্লেখ্য বড় কোষের সংখ্যাই এখানে বেশি। কোন গুরুতর রোগে অথবা জেনেটিক গণ্ডগোলে এই অনুপাত নষ্ট হলে তখন মানুষের চোখে কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ধরা পড়ে না। দিনকানা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রেটিনায় সাধারণক্ষেত্রে লাল ও সবুজ রং বা আলোর পরিবর্তন ধরা পড়ে না। অর্থাৎ চোখের সামনে প্রজ্বলিত কোন লাল আলোকে লাল দেখলেও হঠাৎ সেই আলোকে পরিবর্তন করে সবুজ আলো জ্বালালে এই পরিবর্তনটাকে কোন দিনকানা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধরতে পারে না। রোগ প্রকট হয়ে পড়লে লাল ও সবুজ আলোও এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী কিছু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যেগুলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল ও সবুজের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিকটবর্তী সেগুলিও ধরা পড়ে না। আবার বিড়াল-কুকুর 'জাতীয়' প্রাণীর অল্প আলোতে ভালো দেখার কারণ "দিন কানাত্ব" নয়। এদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য।

উইনেন্ড কাউট্রি, 7 টেলার রোড, কাঁচড়াপাড়া, 24 পরগনা

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত

অরুণাভ সোম

"দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম ধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই অমর বাণী প্রযুক্তিবিদ্যারই জয়গান গেয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার স্বার্থক প্রয়োগ ঘটার জন্যই দেশে দেশে অজস্র ধারায় কর্মের স্রোত প্রবাহিত হয় আর তাতে আসে দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি। ভারতেও এই প্রযুক্তি-বিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগে দেখা দিয়েছে নানান কাজের উৎস। দেশের সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। প্রযুক্তিবিদ্যার স্বার্থক প্রয়োগই দেশকে উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত করতে সহায়তা করে। ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমানে এই প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রযুক্তি কথাটির ইংরেজী 'টেকনোলজি' আর বাংলা পরিভাষা প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ শিল্প বিজ্ঞান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যদিও ভারত এই বিদ্যায় আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্সের তুল্য অগ্রণী দেশের সমকক্ষ নয়, তথাপি এদেশ পৃথিবীর অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশের মতই প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে। ভারতীয় প্রযুক্তি-বিদগণ স্বদেশীয় গঠনমূলক কাজে স্বনির্ভর। ভারতে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছোট বড় শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় 900-এর অধিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সার্বিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বাৎসরিক সরকারি ব্যয়ের অঙ্ক চারশ কোটি টাকার অধিক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ব্যয় ছিল মোট এক কোটি টাকা। প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত প্রসার ঘটে চলেছে কয়েকটি জিনিসের উপর ভিত্তি করে। উদাহরণগুলি হল সমগ্র দেশের শক্তি সম্পদের ব্যবহার। দেশে শিল্পের দ্রুত উন্নতি মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি। ভারতের প্রযুক্তিবিদগণ নানাভাবে দেশের কল্যাণে নিযুক্ত আছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ, আণবিক শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি জটিল প্রযুক্তি কাজের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিবিদগণ তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলির নানা প্রকার গঠন-মূলক কাজে ভারতের প্রযুক্তিবিদগণ সরকারী ও বেসরকারী ভাবে সাহায্যরত আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিজ্ঞানীর প্রয়োগগত বৃহত্তর ক্ষেত্র হল প্রযুক্তিবিদ্যা। আবার এই প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্য বিজ্ঞানীদের উপরই নির্ভর করে। প্রযুক্তি-বিদ ও বিজ্ঞানী যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন প্রযুক্তিগত গঠন কার্যে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীর রকেট, মহাকাশযান নির্মাণ এই প্রযুক্তিবিদ্যার স্বার্থক প্রকাশ। বর্তমানে কি রকেট নির্মাণে, কি শক্তির ব্যবহারের মধ্যেই ভারতীয় প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জয়-জয়-কার সূচিত হয়।" বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে, চাষের ক্ষেত্রে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ নানাভাবে এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের বিজ্ঞানী একক চেষ্টায় কখনও প্রযুক্তিবিদ্যায় সার্থকতা লাভ করতে পারে না। অর্থাভাব, উপযুক্ত বিনিয়োগ না হওয়া, সার্বিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক প্রসারের জন্য সরকার প্রতি বৎসরই নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রকল্পগুলিই মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করে। অতএব এদেশে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই দেশের সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যতীত দেশের উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলতে পারে না। এদিক দিয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মত ভারতও প্রযুক্তিবিদ্যাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জয়জয়কার ঘোষণা করে। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সার্বিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণই অগ্রণী হবেন না এই ব্যাপারে সরকার ও জনগণকে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যও এই বিদ্যার উন্নয়নে যথেষ্ট প্রয়োজন। এইরূপে প্রযুক্তিবিদ্যাকে সফল করার জন্য সকল প্রকার প্রয়াস চালিয়ে গেলেই প্রযুক্তিবিদ্যাতেও ভারত আবার "জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন" নিতে পারবে।

ভারতবর্ষ একদা সভ্যতার উৎসভূমি রূপে সমগ্র বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অর্জন করেছিল। জ্ঞানে গরিমায় শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এই ভারত ছিল অতুলনীয়। তাই আজ আবার প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও এই ভারতের অবদান সার্থক ও পর্যবসিত হোক এটাই আন্তরিক কামনা।

প্রযত্নে গণেশচন্দ্র সোম, ভায়া-পানিপারুল
গ্রাম + পোঃ-নেগুয়া, জেলা-মেদিনীপুর, পিন-721448।

পেঙ্গুইনের কৃত্রিম রাজ্যে

সমরজিৎ কর

কয়েক মাস আগে গিয়েছিলাম ফ্লোরিডায়। ফ্লোরিডার বড়সড় একটি শহর অরল্যাণ্ডো। সেখানকার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের লাউঞ্জে যেতেই চোখে পড়ল বিরাট একটি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে বড় বড় হরফে লেখা সী ওয়ার্লড দেখে যান। তিমির দুর্ধর্ষতম কসরৎ, ডলফিনের নাচ। দেখে যান দুর্লভ পশুপাখি। সেই সঙ্গে পেঙ্গুইন। সঙ্গে নানান অঙ্গভঙ্গীতে কী বিচিত্রই না তাদের ছবি।

সঙ্গে ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক কুল্লিনান। তিনি বললেন, এ জায়গাটা আমারও দেখা হয় নি। কালই চলুন। লস আঞ্জেলেসে রয়েছে বিখ্যাত ডিজনি ল্যাণ্ড। এখান থেকে মোটরে মিনিট পঞ্চাশের পথ— তারপরই পড়বে সী হারবার ড্রাইভ। সেখানেও নতুন সাজে তৈরি হয়েছে আর একটি ডিজনি ল্যাণ্ড। সী ওয়ার্লড তারই একটি অংশ। শুনেছি এটা আরো বড়, আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ। সবচেয়ে ভাল লাগবে আপনার পেঙ্গুইনের কৃত্রিম রাজ্য। শুনেছি, বিরাট একটি ঘরে কুমেরুর মত পরিবেশ সৃষ্টি করে এক দঙ্গল পেঙ্গুইন রাখা হয়েছে সেখানে।

'কুমেরুর পরিবেশ' এবং 'পেঙ্গুইন'—কথা দুটি শুনতেই লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, বেশ তো, চলুন কালই যাওয়া যাক।

পরদিন হোটেল থেকে যখন রওনা হলাম, ঘড়িতে তখন সকাল আটটা। ফ্লোরিডার এ দিকটা সমভূমি। ফ্রিওয়ে দিয়ে কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল একটি রাস্তা। রাস্তাটি বাঁ পাশ ঘুরে চলে গেছে কেপ্ কেনেডির দিকে। কেপ কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ স্টেশন। এখান থেকেই নীল আর্মস্ট্রং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অ্যাপলো মহাকাশ যানে চড়ে চাঁদে গিয়েছিলেন। জন যা বলেছিল তা ঠিকই, মিনিট পঞ্চাশের মধ্যেই আমরা ডিজনি ল্যাণ্ডে পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখা করলাম ফ্রাংক মুরুর সঙ্গে। ইনিই পেঙ্গুইন স্বর্গরাজ্যের কিউরেটার বা রক্ষক।

ফ্রাংক বললেন, পেঙ্গুইনের রাজ্যে যাওয়ার আগে ওদের সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে নিই, কেমন? বলেই পেঙ্গুইন সম্পর্কে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। তারপর টেলিভিশনে দেখালেন মিনিট পনেরর একটি ছবি। সত্যি কথা বলতে কি, ফ্রাংকের বক্তৃতা এবং সেই ছবিটি না দেখলে প্রকৃতির এই বিচিত্র পাখি সম্পর্কে আমার অনেক কিছুই জানা হত না।

শুনে অবাক হবে, পৃথিবীর অতি প্রাচীন এই পাখিদের সম্পর্কে প্রথম বিজ্ঞান নির্ভর বিবরণ দিয়েছিলেন ভূ-পরিব্রাজক ফার্দিনান্দ মেজেলান 1520 সালে। ফ্রাংক বললেন, একমাত্র কুমেরু অঞ্চলেই পাওয়া যায় এই পাখি। তাদের সতেরটি প্রজাতি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এক একটি কালো কোট পরে বুঝি তারা বসে রয়েছে। কোট-গুলি লোমের তৈরি। আসলে লোম নয়, সবই পালক। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালক। তাদের শরীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কম করেও 70টি পালক থাকে। ভারী দেহ নিয়ে ওরা উড়তে পারে না। স্থলভাগে শিকারী জন্তুর কবলে পড়তে হয় না, তাই বাঁচোয়া। ওদের পিঠের দিকটি কালো, বুকের এবং

কৃত্রিম রাজ্যে একটি পেঙ্গুইনকে আদর করছেন ফ্রাংক। পাশে অন্যান্যরা শান্ত হয়ে দেখছে।

পেটের অংশ সাদা। এর ফলে জলের শিকারী প্রাণীর চোখে ওরা ধুলো দিয়ে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারে। ওরা বাস করে শীতল জলস্রোতের পাশে—যেখানে অফুরন্ত খাবার।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদের নাম কেন পেঙ্গুইন হল, বলুন তো ?

পেঙ্গুইন শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ পিঙ্গুইস (Pinguis) থেকে। যার অর্থ 'মোটা'। বললেন ফ্রাংক।

কোন কোন প্রজাতির পেঙ্গুইন তার জীবনের 75 ভাগ সমুদ্রেই বাস করে। ওদের হাড়গুলি ভারি হয়। খাদ্য বলতে প্রধানত চিংড়ি জাতীয় প্রাণী—নাম ক্রিল। এছাড়া মাছ এবং স্কুইডও খায়। কোন কোন প্রজাতি সমুদ্রের গভীরে 700 ফুট পর্যন্ত ডুব দিতে পারে। ডুবে থাকতে পারে 20 মিনিটের মত। ওদের শ্রবণ ক্ষমতা প্রখর। ঘ্রাণশক্তি নেই বললেই চলে। তবে খোলা বাতাস থেকে জলের মধ্যে দেখতে পায় অনেক বেশি। ওরা উড়তে না পারলেও ওদের পূর্বপুরুষরা উড়ে বেড়াত। প্রায় চার কোটি বছর পূর্বে সেই পূর্বপুরুষদেরই কোন কোন প্রজাতি জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে পেঙ্গুইনে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, রূপান্তরের পর এই দীর্ঘ সময়ে তাদের কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

কথায় বলে সুমেরু অঞ্চল হল এসকিমোদের রাজত্ব, আর কুমেরু অঞ্চল পেঙ্গুইনের। কথাটা সত্যি, পেঙ্গুইনের দেখা একমাত্র দক্ষিণ গোলার্ধেই মেলে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত 17টি প্রজাতির পেঙ্গুইনের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। যেমন ধরো, ব্রাশটেইল্‌ড বা দীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট পেঙ্গুইন, এমপারার এবং কিং পেঙ্গুইন, ক্রেস্টেড পেঙ্গুইন, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পেঙ্গুইন, হলুদ চোখো এবং ফেয়ারি পেঙ্গুইন প্রভৃতি। শুনলাম সী ওয়ার্ল্ডে আপাতত নিয়ে আসা হয়েছে তিন রকম পেঙ্গুইন।

দুমঁ দ্য-উরভিলের পত্নীর নামে নাম রাখা হয়েছে আর্ডেলি পেঙ্গুইন। এরা প্রধানত বাস করে কুমেরুর সাগর বেলায়। উচ্চতা 24 থেকে 26 ইঞ্চি। ওজন 10 থেকে 12 পাউণ্ড। এরা ডিম পাড়ে অক্টোবর মাসে। 35 থেকে 37 দিন ডিমে তা দেয়। তারপর ডিম ফুটে বেরোয় বাচ্চা। বাচ্চারা প্রথম তিন চার সপ্তাহ বাড়িতেই থাকে। বাবা-মা খাবার এনে খাওয়ায়। ফেব্রুয়ারি নাগাদ পুরোপুরি পালক গজানর পর তারা বাবা-মার সঙ্গে শিকারে বেরোয়। এদের পুচ্ছ হয় ঝাড়ের মত। এই প্রজাতিরই আর এক ধরনের পেঙ্গুইনের নাম জেণ্টু। এরা উচ্চতায় হয় দুই ফুটের মত, ওজন 14 পাউণ্ড।

খুব বড়সড় পেঙ্গুইন বলতে কিং পেঙ্গুইন। উচ্চতা তিন ফুট। ওজন 40 পাউণ্ড। এরা ডিম পাড়া এবং শাবকদের তা দেওয়ার জন্যে নীড় তৈরি করে না। এরা নিজেদের পায়ের ভাঁজেই সে কাজটি সারে। ক্রেস্টড পেঙ্গুইন বেশ মজার দেখতে। এদের গায়ে ফাঁকে ফাঁকে থাকে হলদে পালক। জাতও অনেক : রক হপার, রয়াল ম্যাজারোনি, স্লেয়ারস আইল্যাণ্ড, ফাইরোড্ল্যাণ্ড, ঘাড় উঁচু ক্রেস্টড প্রভৃতি। রক হপার লম্বায় হয় 15 থেকে 22 ইঞ্চি, ওজন সাড়ে পাঁচ পাউণ্ডের মত।

আর এক শ্রেণীর পেঙ্গুইন দেখা যায় যাদের বলা হয় অ্যালসিডস। চেহারায় এবং চাল চলনে পেঙ্গুইনের মত হলেও এদের ধরন কিন্তু সাধারণ পাখিরই মত। এরা জলে সাঁতার দিতেও যেমন দড়, উড়তেও পারে ঠিক তেমনি। এদের মধ্যে রয়েছে কয়েক জাতের পাখি : পাফিন, মুরে এবং আউকলেট। পাফিনকে সমুদ্র-টিয়েও বলা হয়। এদের ঠোঁটগুলি হয় রঙচঙে। পাফিনরা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে সমুদ্র উপকূল থেকে কিছুটা দূরের দ্বীপগুলিতে। মুরে পেঙ্গুইনরা নীড় বাঁধে পাহাড়ের চূড়ায়। শীতের সময় এদের মাথা এবং গলার অংশের রঙ হয় কালচে-বাদামী, শীতের সময় সাদা।

টেলিভিশনে ছবি দেখার পর ফ্রাংকের সঙ্গে জন এবং আমি গিয়ে ঢুকলাম পেঙ্গুইনের কৃত্রিম রাজ্যে।

বিরাট একটি বাড়ি। সাদা রঙ। দোর গোড়ায় যেতেই রক্ষী বললো, দরজার কাছে জুতো খুলে রেখে যান।

জুতোর সঙ্গে যাতে না কোন রোগ জীবাণু তাদের রাজ্যে গিয়ে হাজির হয়, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

নিজেদের জুতো ছেড়ে ওদের দেওয়া জুতো পরে ঢুকতে হল ভেতরে। কয়েকটি অলিন্দ পেরিয়ে হাজির হলাম—আর তারপরই নিজের চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

বিরাট একটি ঘর। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার সামনে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত কাচের প্রাচীর। বাইরে থেকে ভেতরে বাতাস ঢোকার জো নেই।

ঘরের ভেতরে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়েছে সুমেরুর পরিবেশ। ছোট ছোট পাহাড়। পুরু বরফে ঢাকা। বরফের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের ধারা, নদীর মত। কোন অংশে বরফ উঁচু হয়ে রয়েছে হিমবাহের মত। আর সারাটা ঘর জুড়ে, কোথাও দলবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে, কোথাও বা খাওয়ার জন্যে ছোটাছুটি করছে কম করেও শ' দুয়েক পেঙ্গুইন। কিছুক্ষণ আগে ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম, তেমন। দলবদ্ধ পেঙ্গুইনগুলি শিরদাঁড়া উঁচু করে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাও দেখলাম, যেন মানুষের মত।

কর্মীরা মাছ দিলেন। ক্রিল এবং সাদা সাদা এক ধরনের মাছ। দেখতে কতকটা সাগর চেলার মত। গিলে ফেললো তারা।

ভেতরের তাপমাত্রা শূন্যের 25 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। বললেন ফ্র্যাংক।

তিনটে কিং পেঙ্গুইনের মাথায় সাদা টুপি পড়ান। টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে রঙ বেরঙী তার। তারগুলির প্রান্ত অদূরে একটি ইলেকট্রোনিক যন্ত্রের সঙ্গে জোড়া। ঘরের মধ্যে সরাসরি কোন আলো নেই। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়েছে মৃদু আভা। বলতে পারো, মেরু প্রভার মত।

দেখলাম, দুজন বিজ্ঞানী ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি নাড়া-চাড়া করছে।

ফ্রাংক বললেন, এখানে পেঙ্গুইন নিয়ে ওই দুই বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। কৃত্রিম পরিবেশে তাদের শরীরে রক্তের প্রবাহ কেমন দাঁড়ায়, মস্তিষ্কে কাজ কেমন চলে সে সব নিয়েই পরীক্ষা। এসব পরীক্ষা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে যাঁরা কুমেরু অঞ্চলে গিয়ে কাজ করছে তাদের নিরাপত্তায় কাজে লাগান হবে।

দেখলাম, পেঙ্গুইন সত্যিই নিরীহ পাখি। যিনি মাছ দিচ্ছিলেন তাঁর ঘাড়ে উঠেছে। কোনটি, কোনটি মুখ বাড়িয়ে হাতের মাছের দিকে চেয়ে আছে। আদুরে শিশুর মত।

একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্যই হলাম। কুকুর বা ওই ধরনের প্রাণীর সামনে খাবার দিলে তারা যেমন মারামারি করে, পেঙ্গুইনরা কিন্তু তা করল না। তারা মোটামুটি ধীরে সুস্থে খাবার নিল। একজনের মুখের খাবার আর একজনকে কেড়ে খেতে দেখলাম না।

ঘন্টাখানিক দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। তাদের আচরণ এত শান্ত, অন্যান্য পাখির মধ্যে তা চোখে পড়ে না।

বিজ্ঞান সাধক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
সপ্তম বার্ষিক স্মরণ সভা

৮ই এপ্রিল, ১৯৮৮, বিকাল ৫টায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর "সত্যেন্দ্র ভবনে"
পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

সভাপতি—ডঃ জয়ন্ত বসু
প্রধান অতিথি—ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
বিশিষ্ট অতিথি—ডঃ বীরেন্দ্র বিজয় বিশ্বাস
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন শ্রীনারায়ণ সান্যাল

বিষয়—সাহিত্য ও বিজ্ঞান।

সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে ভাস্কর রায় পরিচালিত "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য" শীর্ষক রঙ্গীন তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

—উদ্যোক্তা—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান,
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি।

বিজ্ঞানের ডায়েরী—এপ্রিল বিমান বসু

1 এপ্রিল 1578, বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ এবং শরীরে রক্ত চলাচল (circulation of blood) প্রণালীর আবিষ্কারক উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) এইদিন ইংলণ্ডের ফোকস্টোন (Folkstone)-এ জন্মগ্রহণ করেন। 1602 সালে ইতালীর পাদুয়া (Padua) থেকে যখন তিনি ডাক্তারি পাশ করেন সে সময় শরীরে হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলেও ভুল ধারণা ছিল। মনে করা হতো যে, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌঁছে সেখানেই বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন জন্তুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেন যে হৃৎপিণ্ড মূলতঃ একটা বিশেষ ধরনের পাম্প যা কেবলমাত্র শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য করে। শরীরের ধমনী-গুলি হৃৎপিণ্ড থেকে বিশোধিত রক্ত বিভিন্ন অংগপ্রতংগে পৌঁছে দেয়, এবং সেখান থেকে অশুদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ঐ হৃৎপিণ্ডই আবার অশুদ্ধ রক্তকে ফুসফুসে পাঠায় এবং সেখান থেকে অক্সিজেনযুক্ত বিশোধিত রক্ত গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠায়। তাঁর এইসব আবিষ্কারের বিবরণ 1628 সালে "An Anatomical Treatise on the Movement of the Heart and Blood in Animals" নামক একটি ছোট পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। 1631 সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। 1657 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

1 এপ্রিল 1960, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্বের প্রথম উপগ্রহ আমেরিকার "টাইরস-1" (TIROS-1)-কে এইদিন মহাকাশে ছাড়া হয়। উপগ্রহটির নাম "Television and Infra-Red Observation Salellite"-এরই সংক্ষিপ্ত রূপ। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 700 কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে স্থাপিত উপগ্রহটি নিয়মিতভাবে মেঘের ছবি এবং ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে তাপ বিকিরণ সম্পর্কে তথ্য পাঠায়।

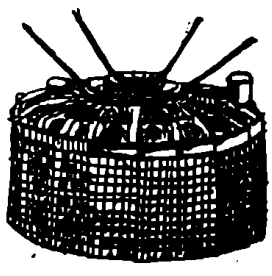

3 এপ্রিল 1984, ভারতের প্রথম মহাকাশ যাত্রি স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মা এইদিন দু'জন সোভিয়েত মহাকাশ যাত্রির সঙ্গে সোয়ুজ-টি 11 (Soyuz-T 11) যানে চড়ে মহাকাশযাত্রা শুরু করেন। পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত 'স্যালিয়ুত' (Salyut-7) মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছে এক সপ্তাহ ধরে ভারশূন্য অবস্থায় তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের বহু ছবি তোলেন। 11 এপ্রিল 'সোয়ুজ-টি-10' (Soyuz-T 10) যানে চড়ে তিনজনই নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

6 এপ্রিল 1973, আমেরিকার গ্রহযান 'পাইয়োনিয়ার-11' (Pioneer-11)-কে এইদিন বৃহস্পতি গ্রহ অভিমুখে পাঠানো হয়। 1974 সালের 2 ডিসেম্বর বৃহস্পতি থেকে 42,800 কিলোমিটার দূর দিয়ে যাবার সময় বহু রঙীন ছবি ও তথ্য পাঠায়। এরপর 1979 সালের 1 সেপ্টেম্বর শনিগ্রহের কাছে পৌঁছয়। শনিগ্রহের 20,800 কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবার সময় বহু ছবি ও তথ্য পাঠায়। 'পাইয়োনিয়ার-11ই' ছিল প্রথম গ্রহযান যা শনিগ্রহের খুব কাছে পৌঁছে তার ছবি তুলে পাঠায়।

10 এপ্রিল 1927. এইদিন বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতি-বিজ্ঞানী এম. কে. ভেইনু বাপ্পু (M. K. Vainu Bappu) জন্মগ্রহণ করেন। 1952 সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করার পর কিছুদিন হেল (Hale Observatory) মানমন্দিরে গবেষণা চালান। ঐ সময়েই তিনি বিখ্যাত 'উইলসন বাপ্পু প্রভাব' বা Wilson-Bappu Effect আবিষ্কার করেন যার ভিত্তিতে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। 1954 সালে তিনি নৈনিতালে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মানমন্দিরের (UP State Observatory) ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এরপর 1960-77 কোডাইকানাল মানমন্দির এবং 1977 থেকে নিয়ে 1982 সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞান সংস্থা বা Indian Institute of Astrophysics-এর ডিরেক্টর পদে ছিলেন। তাঁরই একনিষ্ঠ চেষ্টায় তামিলনাড়ুর কাভালুর (Kavalur)-এ এশিয়ার বৃহত্তম মানমন্দিরটি গড়ে ওঠে। সেখানে 1986 সালে যে 232·5 সেণ্টিমিটার ব্যাসের প্রতিফলক দূরবীনটি স্থাপন করা হয়েছে, বাপ্পুর সম্মানে সেটির

[শেষাংশ 61 পৃষ্ঠায়]

প্রানী বিচিত্রা - শৈল চক্রবর্তী

পাফিন (PUFFIN) এক বিচিত্র পাখি।

পাফিন পাখির ঠোঁট দেখতে অদ্ভূত। তারা থাকে ডাঙায় কিন্তু জলে নেমে মাছ ধরে খায়। এই পাফিন অন্য স্ত্রী-পাফিনের সান্নিধ্যে এলে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তার মনোরঞ্জনের জন্য যুবক পাফিনের ভঙ্গি বদলে যায়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে তার ঠোঁটের বাহার দেখায়। সত্যিই তার ঠোঁট নানান আঁকা বাঁকা রেখায় ও রঙে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে তখন।

এখানে পাফিন শিকারে ব্যস্ত। তার ঠোঁটের সূচাগ্রভাগ দিয়ে সে কৌশলে এবং অতি চটপট দ্রুতগতিতে মাছ ধরতে থাকে।

KJB/APRIL/2/88

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

রাগে দুঃখে ঘৃণায় কলম্বাস বিহ্বল হয়ে পড়লেন। স্বয়ং রাজা এমন বিশ্বাসঘাতক? যে পোর্তুগালকে নিজের দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে মেনে নিয়েছিলেন কলম্বাস সেই পোর্তুগালে আর পড়ে থাকতে মন চাইলো না। কী লাভ এমন এক প্রবঞ্চক রাজার রাজত্বে জীবনের অমূল্য দিন গুলি বায় করে?

ভেঙে পড়তে কলম্বাস জানেন না। তাঁর অটল বিশ্বাস তাঁকে ধ্রুবতারার মতো চালিত করে আপন লক্ষ্যে। একদিন এক রাতের আঁধারে ছেলে দিয়েগো আর ভাই বার্থালোমিউকে সঙ্গে নিয়ে পোর্তুগালের বাসভূমি ত্যাগ করলেন কলম্বাস। ইউরোপ এক বিশাল মহাদেশ। সেখানে কতো রাজ্য, কতো রাজা। তাঁদের কেউ কি সাহায্য করবেন না? দিনের পর দিন কলম্বাস ছুটে চললেন এক রাজার দরবার থেকে আর এক রাজার দরবারে। কেউ তাঁর কথা শুনলেন, কেউ কানেই নিলেন না। কেউ তাঁকে মনে করলেন—উন্মাদ। কেউ ভাবলেন—রাশি রাশি অর্থ নাশ করে এমন অসম্ভব একটা ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রত্যাখ্যাত কলম্বাস অনেক দিন পরে তাঁর জন্মভূমি জেনোয়ার মাটিতে ফিরে এলেন। বড়ো আশা, এখানে কোনও সাহায্য নিশ্চয়ই মিলবে।

কিন্তু হোল না। এখানেও সেই প্রত্যাখ্যানের হতাশা নিয়েই তিনি ফিরে এলেন পুরানো আবাসে। দিনের পর দিন অনেক ভাবলেন। একটি শুধু আশা, ইংল্যাণ্ডের রাজা এখনো জানেন না। যদি তাঁর কাছে প্রস্তাবটা যায়, তিনিও কি প্রত্যাখ্যান করবেন? নাকি ভেবে দেখবেন? ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে এখন রাজা সপ্তম হেনরী। সুশাসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলম্বাস শুনেছেন। অতএব তিনিই একমাত্র ভরসা।

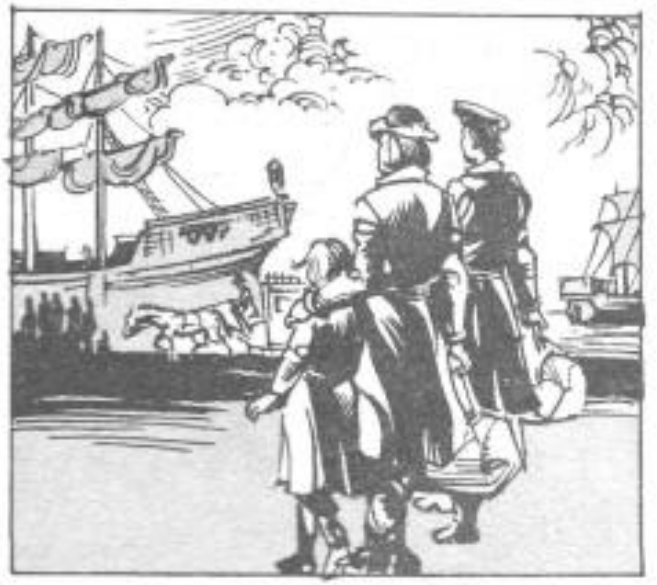

দিনের পর দিন যায়। অবশেষে একদিন মিলে গেল একটি ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজ। দীর্ঘদিনের যাত্রা, অতএব অনেক টাকার প্রয়োজন। কলম্বাস তাঁর ধন-সম্পত্তি সব জলের দরে বেচে দিয়ে ভাই বার্থালোমিউকে পাঠালেন ইংল্যাণ্ডে। জেনোয়ার বন্দর থেকে শেষ বিদায় যখন জানাচ্ছেন, তখন চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে কলম্বাসের। সব শেষ। বার্থালোমিউ যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে...।

না দাদা, আমি বলছি, তা হবে না। রাজা হেনরী এমন অবিবেচক হতে পারেন না। তিনি মহৎ, তিনি বিচক্ষণ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা। আমি তাঁর আমন্ত্রণ-লিপি নিয়ে ফিরে আসবো নির্দিষ্ট সময়ে।

কলম্বাসের দুর্ভাগ্য—সে সময় আর এলো না। রাজা হেনরীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ বার্থালোমিউ পেলো না। মাঝপথে এক সন্ধ্যায় জলদস্যুদের দল জাহাজ আক্রমণ করলো। মাসের পর মাস গেল, বার্থালোমিউ ফিরলো না। অস্থির হয়ে উঠলেন কলম্বাস। কী হয়েছে বার্থালোমিউর? ভাইটি তো তাঁরই কাজ নিয়ে সেই সুদূর যাত্রায় বেরিয়েছিল। ভালো আছে তো সে? চিন্তায় চিন্তায় কলম্বাস যখন কাতর তখন একদিন ফিরে এলো বার্থালোমিউ। ভিখারীর মতো চেহারা। জলদস্যুদের বন্দীশালা থেকে অনেক কষ্টে সে পালাতে পেরেছিল। তারপর জাহাজের পর জাহাজে নানা কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত জেনোয়ার মাটিতে ফিরেছে।

এ সময়ই একদিন পোর্তুগাল থেকে রাজা জনের বিশেষ দূত জেনোয়ায় পৌঁছলো। অনুতপ্ত রাজা জন কলম্বাসকে ডেকেছেন। তিনি নতুন করে আবার কথা বলতে চান উৎসাহী তরুণটির সঙ্গে। কলম্বাস হাসলেন। বড়ো ম্লান, বড়ো করুণ সেই হাসি। চিন্তায় চিন্তায় মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে কবে। কে বলবে—তাঁর বয়স সত্তরি কতো।

না, অসম্ভব, কলম্বাস যাবেন না। রাজার মতো ব্যবহার করতে যিনি জানেন না, তাঁর দরজায় আর নয়। তবু একই পথে কলম্বাস এলেন, কিন্তু লিসবনে আর ফিরলেন না। দক্ষিণ স্পেনে সাময়িক ভাবে বাস করতে করতে তিনি চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্সের রাজাকে। প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান পেয়েও কিন্তু দমলেন না। ইউরোপের এক বিশাল ভূ-খণ্ডের উপহাস দু'হাতে কুড়িয়েও আপন বিশ্বাসে কলম্বাস অবিচল।

(ক্রমশ)

চট জলদি

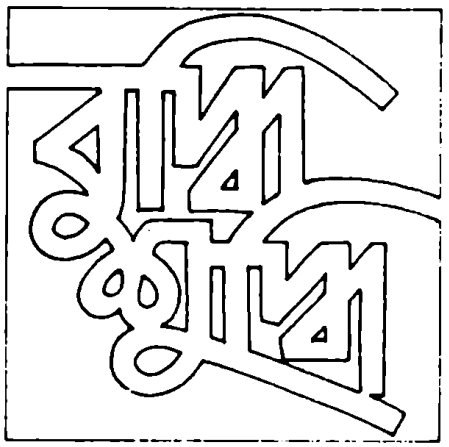

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

তোমরা অক্ষর সাজিয়ে ছক পূরণ করে নানা রকম শব্দ তৈরি করতে অভ্যস্ত। এখানে একটা ঐ জাতীয় ছক দিলাম। তফাৎ যেটা, সেটা হল এখানকার ছক পূরণ করতে হবে অক্ষরের বদলে সংখ্যা দিয়ে। সূত্র দেখে করে ফেল। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধিশুদ্ধির পাতায় এটা কেন এল ? তোমার একটা ছোট্ট পরীক্ষা হয়ে যাবে এখানে। পুরো ছক ভরতে তুমি যদি সময় নাও পাঁচ মিনিট তাহলে 'সাধারণ', আর যদি তিন মিনিট সময় নাও তাহলে অঙ্কে তুমি চটপটে (বুদ্ধিতেও)।

সূত্র-পাশাপাশি

ক) $774 \div 86$, খ) 271×6, চ) 41×3, জ) $117 - 88$
ঝ) $204 \div 34$, ঞ) 809×3, ঠ) 427×5, ঢ) $84 \div 12$
ণ) $396 \div 4$, ত) 76×7, দ) 2459×3, ন) $144 \div 16$

উপর নিচ :

ক) ন'শ ষোল হাজার, দু'শ সাতানব্বই, খ) 49×27, গ) $42 \div 7$, ঘ) 37×6, ঙ) ছ'শ সাতানব্বই হাজার, সাতশ' উনত্রিশ, ছ) $232 \div 29$, ট) 651×7, ড) $57 + 136$, থ) $1467 \div 489$

ক		থ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ			জ	
ঝ		ঞ	ট		
ঠ	ড				ঢ
ণ			ত	থ	
দ		ধ			ন

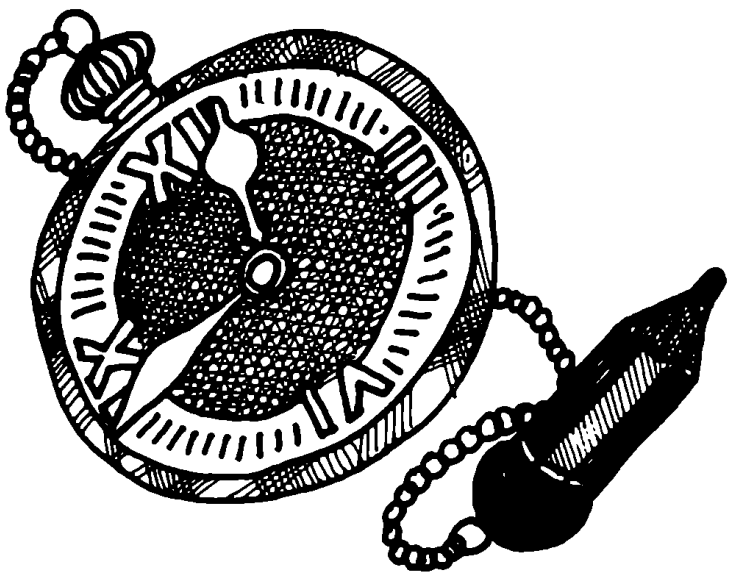

বুদ্ধিশুদ্ধি : নড়া চড়া ছবির সমাধান

আমাদের চোখে যখন ছবি পড়ে অর্থাৎ আমরা যখন দেখি তখন তার ছবি চোখের মধ্যে তৈরি হয়। যখন একটা জিনিস থেকে অন্য জিনিসে চোখ সরাই তখন আগের ছবি মিলিয়ে গিয়ে অন্য ছবি তৈরি হয়। এটা হয় খুব দ্রুত। দ্রুত হলেও ত খানিকটা সময় লাগে। আর সে সময়টা মোটামুটি এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ। পেন্সিল চালাবার সময় যা ঘটছে তা সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়েরও কম সময়ে। তাই দুটি ছবি মিলে মিশে ঐ ঘটনাটা ঘটছে। মনে রেখো এটাই হলো চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা।

রামব্রহ্ম সান্যাল

অজয় হোম

রামব্রহ্ম সান্যাল ছিলেন কলকাতার চিড়িয়াখানার প্রথম অধিকর্তা বা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যা কিছু বৃত্তান্ত আমাদের গোচরে এনেছেন কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান ডঃ দিলীপকুমার মিত্র। তিনি রামব্রহ্মর জন্ম তারিখ উদ্ধার করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেন 1875 খ্রীস্টাব্দে কলকাতা চিড়িয়াখানার উদ্বোধনের পর এক বছর বাদে 1876 সালে তিনি যোগদান করেন। রামব্রহ্ম সেই সময় স্থানীয় মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছিলেন। কিন্তু ডাক্তারদের কথায় দু'বছর ডাক্তারি বিদ্যা শেখার পর চোখের অসুখের জন্য সেই শিক্ষা পরিত্যাগ করতে হয়।

সেই কলেজের ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছিলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা চিড়িয়াখানার বোর্ডের একজন সভ্য। তাঁর চেষ্টায় এই হতভাগ্য ছাত্রটির জন্যে একটি কাজ ঐ চিড়িয়াখানায় যোগাড় করে দেন। রামব্রহ্ম চিড়িয়াখানার সামান্যতম শ্রমিক হিসেবে যোগদান করেন। এর চেয়ে নিম্নতম কাজ আর কিছু ছিল না।

কিন্তু এই অবস্থায় তাঁকে বেশিদিন কাটাতে হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণিরক্ষার পদে উন্নীত হন। তাঁর কাজের মধ্যেই প্রাণিদের আচার ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করতে থাকেন। ক্রমে উন্নততর শিখরে আরোহণ করতে করতে চিড়িয়াখানার অধিকর্তা বা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ আরও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির খোঁজ করেন কিন্তু রামব্রহ্মের মতো উপযুক্ত ব্যক্তির খোঁজ তাঁরা পান না।

1889 খ্রীস্টাব্দে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুরোধ করেন চিড়িয়াখানার উপর একটি বই লিখতে যাতে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কলকাতা চিড়িয়াখানার পশুপাখি রাখা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে। 1892 খ্রীস্টাব্দে তাঁর বই A handbook of wild Animals in captivity in Lower Bengal প্রকাশিত হয়। বইটির সংস্করণ শেষ হবার পর বইটি আর প্রকাশিত হয় নি।

1898 খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন জুওলজিকাল সোসাইটি তাঁকে পত্রাদি লিখন বিভাগে সভ্য হিসেবে বরণ করেন। সেই সময় বিশেষত একজন ভারতীয়ের পক্ষে এই সম্মান লাভ খুবই দুরূহ ছিল। এই সময় রামব্রহ্ম ভারতের বাইরে যান।

এই সময়ে রামব্রহ্মের একমাত্র পুত্র সন্তানের হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেই শোকে তাঁর স্ত্রীরও কিছু দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। রামব্রহ্ম খুবই ভেঙে পড়েন। চিড়িয়াখানার দৈনন্দিন কাজ দেখা ছাড়া আর কোনও কাজই তাঁর দ্বারা হয় না। এর ফলে আর কোনও পুস্তক লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এইভাবে ষোল বছর চিড়িয়াখানায় তিনি কাটান।

রামব্রহ্মের চিড়িয়াখানা থেকে অবসর গ্রহণের সময় আসে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তাঁর জায়গায় কাকে আনবেন স্থির করতে পারেন না। তাঁকে অনুরোধ করেন আরও এক বছরের জন্যে কাজ চালিয়ে যেতে। 1908 সালে রামব্রহ্ম এই চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু কিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায় না।

ইলেকট্রনিকস্ কুইজ Part III

বিপ্লব ব্যানার্জী

প্রশ্ন সংখ্যা = 12 সময় = 10 মিনিট

1. ইলেকট্রনিকস্ শিল্পে যে দুটি মৌল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তা হল,—

(a) ক্যাডমিয়াম, (b) ক্যালসিয়াম, (c) সিলিকন, (d) জিঙ্ক, (e) পটাসিয়াম, (f) জার্মেনিয়াম, (g) সোডিয়াম।

2. শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(a) খুব সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে এমন বস্তুকে বলা হয় – —

(b) যৎ সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে এমন বস্তুকে বলা হয় ——

(c) মাঝামাঝি বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে এমন বস্তুকে বলা হয় – —

3. কম্পাঙ্ক বাড়লে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—

(a) বাড়ে, (b) কমে, (c) একই থাকে

4. একটি রেডিও ওয়েভের কম্পাঙ্ক 1000 Kilo Hertz হইলে ঐ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে—(a) 3 মিটার, (b) 30 মিটার, (c) 300 মিটার।

5. একটি তামার তারের রোধাঙ্ক, ব্যাসার্ধ এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $1 \cdot 6 \times 10^{-6}$ Ohm cm 1 cm এবং π cm হইলে উক্ত তারের রোধ কত ?

6. আলোর গতিবেগ 'c' এবং যে কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (f) ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ-Lamda) এই তিনটির মধ্যে একটি সম্বন্ধসূত্র আছে যা হল, (a) $f = C \cdot \lambda$, (b) $c = f \lambda$, (c) $\gamma = c \cdot f$

7. নিচে Transistor ও valve এর কতগুলি element মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হল। যেটির সংগে যার মিল তা খুঁজে বার কর। (a) Cathode, (b) Collector, (c) Grid, (d) Emitter, (e) Base, (f) Anode

8. 'A' স্থান হইতে 4186 কিলোমিটার দূরবর্তী 'B' স্থানে একটি Radio-wave আসতে যে সময় লাগবে—

(a) 0·1 second (প্রায়), (b) 0·005 second (প্রায়), (c) 1 second (প্রায়) (d) 0·0001 second (প্রায়), (e) 29 মিলি সেকেণ্ড (প্রায়) (f) 14 মিলি সেকেণ্ড (প্রায়), (g) কোন সময়ই লাগবে না।

9. Medium-wave Radio-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক হল—

(a) 20 Kilo Hertz to 100 Kilo Hertz এর মধ্যে –

(b) 550 Kilo Hertz to 1650 Kilo Hertz-এর মধ্যে

(c) 100 Kilo Hertz to 1 Mega Hertz এর মধ্যে

10. শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

পরমশূন্য তাপমাত্রায় সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সিলিকন — — মত ব্যবহার করে।

11. নিচের কোনটি ঠিক ? (যেখানে cps = cycle per second)

(a) 10 cps = 1 Hertz. (b) 2 cps = 1 Hertz, (c) 1 cps = 1 Hertz.

12. একটি রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিলি-মিটার এবং আলোর গতিবেগ 3×10^{8} meters / sec হইলে উক্ত রেডিও তরঙ্গের কম্পাঙ্ক হবে—

(a) 3 Giga Hertz, (b) 30 Giga Hertz, (c) 300 Giga Hertz, (d) 300 Mega Hertz

ইলেকট্রনিকস্ কুইজ—Part-III-র উত্তর

1. (c), (f), 2. (a) (পরিবাহী), (b) (অন্তরক), (c) (অর্ধ পরিবাহী) 3. (b), 4. (c), 5. [1·6 micro Ohm (প্রায়)], 6. (b), 7. (a, d), (b, f), (c, e), 8. (f), 9. (b), 10. অন্তরকের, 11. (c). 13. (c)

17, নং যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলি-61

সংশোধনী

মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাগর গভীরে সমুদ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ 'সাগর গভীরে সুড়ঙ্গ' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

কম্পিউটার তৈরি হবার গল্প

চার্লস ব্যাবেজ

1800 শতাব্দির মানুষ চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ছিলেন এক জিনিয়াস। যখন ভাল রকম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরই তৈরি হয়নি, তিনি তখন একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার তৈরি করার প্ল্যান করে বসলেন। বলাই বাহুল্য, সব জিনিয়াসের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, লোকেরা তাঁর পরিকল্পনাকে এক বদরাগী ছিটগ্রস্ত মানুষের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলেন। দুঃখের বিষয়, তখনকার যান্ত্রিক প্রযুক্তি তাঁর পরিকল্পিত কম্পিউটার (যার নাম তিনি দিয়েছিলেন অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন Analytical Engine) তৈরির পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। ব্যাবেজের জীবদ্দশায় তাই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কম্পিউটার তৈরি না হলেও কম্পিউটারের প্রতিটি পর্যায় কিভাবে কাজ করবে, কিভাবে তাকে প্রোগ্রাম করা হবে, সেই প্রোগ্রাম কিভাবে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে সংরক্ষণ করা হবে, সে সমস্ত ডায়াগ্রাম, এমন কি কম্পিউটারটি চালাবার উপযুক্ত প্রোগ্রাম পর্যন্ত ব্যাবেজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন।

অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের প্রোগ্রাম লেখার কাজে ব্যাবেজ বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রনের (Lord Byron) মেয়ে অ্যাডা অগাস্টিন লেডি লাভলেস (Ada Augustine Lady Lovelace)-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। অ্যাডাই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার। অ্যাডার নাম চিরস্মরণীয় রাখতে Ada নামে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ডাটা তৈরি করা হয়েছে, আর চার্লস ব্যাবেজ পেয়েছেন কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠাতার সম্মান।

* চার্লস ব্যাবেজ ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

পাঞ্চ কার্ড মেশিন এবং হারমান হলেরিথ

ব্যাবেজের মৃত্যু হয় 1871 সালে। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর কম্পিউটার নিয়ে আর কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। এরপর প্রথম পুনরায় কম্পিউটার তৈরির দিকে মনোযোগ দেন অ্যামেরিকার ড. হারমান হলেরিথ (Dr. Harman Holarith)। পাঞ্চ কার্ডের সাহায্যে প্রোগ্রাম করা যায় এমন যন্ত্রগণক তৈরি করে হারমান হলেরিথ বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখে অ্যামেরিকার জনসংখ্যা গণনা বিভাগ পাঞ্চ কার্ড মেশিন কিনে নেন। এতে হলেরিথ উৎসাহিত হয়ে পাঞ্চ কার্ড মেশিন তৈরি করার একটি কোম্পানি খোলেন। এই কোম্পানিই পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে একত্রিত হয়ে ইণ্টারন্যাশানাল বিজনেস মেশিন বা সংক্ষেপে J B M কোম্পানি তৈরি করে।

UNIVAC এবং IBM 650-র প্রতিযোগিতা

1951 সালে UNIVAC নামে একটি শক্তিশালী (তখনকার প্রযুক্তির মাপকাটিতে) তৈরি হলে JBM-এর পাঞ্চ কার্ড মেশিন বাতিল করে অ্যামেরিকার জনসংখ্যা গণনা বিভাগ UNIVAC-এর অর্ডার দেন। JBM-এর কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন পাঞ্চ কার্ডের সময় গেছে। তাই তাঁরাও তিন বছরের মধ্যে তৈরি করে ফেলেন IBM 650 নামে একটি অপেক্ষাকৃত কম দামী কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্র। সেই ছিল বলা যায় কম্পিউটার তৈরির প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

ট্রানজিস্টারের আবিষ্কার

তবে 1900 শতকের গোড়ার দিকে কম্পিউটার মোটেই তেমন চমকপ্রদ যন্ত্র ছিল না। আজ যেমন আমরা রেডিও, টিভি, কাগজে সর্বত্রই কম্পিউটারের কথা বা বিজ্ঞাপন দেখি, তখন কিন্তু কম্পিউটারকে সাধারণ লোকে কোনোই গুরুত্ব দিতেন না। সে সময়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অ্যামেরিকার মিলিটারি বিভাগ। তাঁরা কম্পিউটারকে কামানের গতিপথ নির্দেশকারী তালিকা তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতেন। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তখনকার কম্পিউটার তো আজকের আধুনিক কম্পিউটারের মত ছোট আর শক্তিশালী ছিল না। সাধারণ চল্লিশ টাকার পকেট ক্যালকুলেটরের সমান শক্তিশালী একটি কম্পিউটার আকারে হত একটি হল ঘরের সমান বড় আর অসম্ভব দামী।

1947 সালে অ্যামেরিকার বেল ল্যাবরেটরি (Bell Laboratory) তে জন বার্ডিন, উইলিয়াম শকলে আর জন ব্র্যাটেন আবিষ্কার করলেন ট্রানজিস্টার (Transistor)। ট্রানজিস্টারের আবিষ্কার কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এক নতুন

উন্নতির জোয়ার আনলো। কম্পিউটার হয়ে উঠলো আরো শক্তিশালী। আকারে ছোট আর দামেও অপেক্ষাকৃত সস্তা। ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে তৈরি কম্পিউটারকে তাই সেকেণ্ড জেনারেশন (Second Generation) বা দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হতে লাগলো।

সিলিকন ভ্যালি

উইলিয়াম শকলে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করেই বসে রইলেন না। ইলেক্ট্রনিক্সের ওপর আরো মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বেল ল্যাবরেটরি ছেড়ে দিলেন আর শকলে সেমিকণ্ডাক্টার নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলেন। শকলের সঙ্গে রইলেন আটজন প্রতিভাবান সহকারী। তাঁদের মধ্যে একজন শকলের কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে নিজে আলাদা ভাবে আর একটি কোম্পানি তৈরি করলেন। এই কোম্পানিটির নাম হল ফেয়ার চাইল্ড। আজ সেই ফেয়ার চাইল্ড এক ডাকসাইটে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রাংশ নির্মাতা হিসেবে সারা পৃথিবীতে নাম করেছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল ফেয়ার চাইল্ডে। ফেয়ার চাইল্ড ছেড়ে দিলে আরো দুজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁরা নিজেরা দুটি আলাদা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কোম্পানি দুটি হল ইন্টেল (Intel) আর অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইসেস। এই সব কোম্পানি থেকে আরো অনেকে বেরিয়ে গিয়ে আরো সব কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। পুরো ঘটনাটি যেন পরমাণু বিভাজনের চেন রিয়াকশনের মতো ঘটে গেল। তবে একটা মজার ব্যাপার হলো, সব কটি কোম্পানিই তাদের কারখানা অ্যামেরিকার সান্তা ক্লারা উপত্যকায় স্থাপন করলেন। আগে সান্তা ক্লারাতে হত চেরী, প্লুন আর অ্যাপ্রিকট বাদামের চাষ। একরের পর একর ছিল তারই বাগান। এই সমস্ত কোম্পানির কারখানা বানানোর পর এখন সান্তা ক্লারাতে সেই চেরী বা অ্যাপ্রিকট গাছের বাগানই বিরল হয়ে গেছে। এমন কি সান্তা ক্লারার নতুন নামকরণও করা হয়েছে—সিলিকন ভ্যালি (Silicon Valley)। এই সিলিকন ভ্যালিই আধুনিক ইলেক্ট্রনিক আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। বর্তমানে সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রতি বছর তিন হাজার তিনশো কোটি টাকারও বেশি ইলেক্ট্রনিক্স আর কম্পিউটার যন্ত্রাংশের ব্যবসা পত্র চলে। সেই সঙ্গে চলে ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায় টিকে থাকার মরণপণ লড়াই।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রথম পাঠ

১ম ও ২য় খণ্ড—এখন দুটি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি খণ্ড ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

আমাদের ভেষজ উদ্ভিদ

○ সীমা সেন

আমরা অসুখ করলে ওষুধ খাই। অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি যে ওষুধই খাই না কেন, বেশির ভাগ ওষুধই তৈরি হয় গাছ-গাছড়ার নির্যাস থেকে, তফাৎ কেবল প্রয়োগ কৌশলের। যদিও কৃত্রিম উপায়ে বেশ কিছু ওষুধই তৈরি করা হয় তবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে উদ্ভিদজাত ওষুধের চাহিদাই বেশি। আমাদের খুব গর্বের বিষয় হল, গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। মহর্ষি চরকের লেখা 'চরক সংহিতা' এবং সুশ্রুতের লেখা 'সুশ্রুত সংহিতা' অতি বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। সেখানে গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরির ব্যাপারে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। ভাবতে আনন্দ হয় যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক এসব বিষয়ে অন্ধকারে তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা আমরা বুঝতে পারিনি যতদিন না পর্যন্ত বিদেশী মনীষীরা এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। ভারতবর্ষের জল হাওয়ার বৈশিষ্ট্যের জন্য বহুরকম ভেষজ উদ্ভিদের চাষই সম্ভব। আশপাশে বহু গাছপালা আছে যারা এখানে সেখানে হয়ে থাকে কিন্তু তাদের রোগ নিরাময়ের দারুণ ক্ষমতা। আজকাল অনেক রকম গাছ চাষ করা হয় বহু একর জুড়ে কেবল ওষুধ তৈরির জন্যই এবং বিদেশে তা রপ্তানী করাও হয়। এখানে ঐরকম দু'চারটে গাছের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের অনেকের বাগানেই সাদা বা গোলাপী রং-এর নয়নতারা ফুলের গাছ আছে। বারমাস ফুল ফোটে বলে অনেক বাড়িতে মা-মাসীরা এই গাছের খুব ভক্ত, অন্য ফুল পাওয়া যাক-না-যাক এই বারমেসে নয়নতারা নিত্য দু'চারটে ঠাকুরের পায়ে দেওয়া যাবে। আর খুব একটা বিশেষ যত্নেরও দরকার নেই। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারের দুপাশে 'হেজ' হিসাবেও এই গাছ লাগান হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় ছাদের ভাঙা দেওয়ালে কি কার্নিশেও নয়নতারাকে দেখতে পাওয়া যায়। মোট কথা এরা বেশ কষ্ট সহিষ্ণু গাছ। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রং-এর হয়। প্রত্যেক ডালের ডগায় দু'চারটে করে ফুল ফোটে। লম্বায় খুব একটা বাড়ে না, হাত দু'য়েক মত হয়। বৈজ্ঞানিক নাম **ক্যাথারানথাস্ রোসিয়াস** (Catharanthus roseus)। এই গাছের আশ পাশ দিয়ে ঘুরলে একটা বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। এদের শরীরে রয়েছে অসংখ্য অ্যালকালয়েড, মনে হয় সে কারণেই এই গন্ধ।

বাগান সাজানোর কাজে এ গাছ লাগালেও বৈজ্ঞানিক মহলে একে নিয়ে দারুণ হৈ চৈ। এই গাছ থেকে একশ'র ওপর অ্যালকালয়েড পাওয়া গেছে। এখনও সমানেই নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ এর থেকে আবিষ্কার হচ্ছে আর বৈজ্ঞানিকেরা পাতার পর পাতা বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। তবে সারা বিশ্বে এর বিশেষ কদর 'ভিনব্লিসটিন' এবং 'ভিনব্লাসটিন'-এর জন্য। এই দুই অ্যালকালয়েড ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। তবে মুশকিল হল পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে (0·00025%)। ধরা যাক বড় বাজারের থলের এক থলে, শুকনো পাতা থেকে হয়তো এক পোস্তদানা ওষুধ পাওয়া গেল। এতে খরচ-মজুরি কিছুই পোষায় না। তাই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অ্যালকালয়েডের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঔষধ শিল্পে প্রায় 100 টন মত পাতার প্রয়োজন হয়। এছাড়াও এই গাছের শিকড়ে পাওয়া যায় 'রাউ বেসিন' বা 'অ্যাজমালিসিন,, যার চাহিদা রয়েছে ভেষজ শিল্পে বিশাল। বাৎসরিক 100 টন মত শিকড় লাগে পশ্চিম জার্মানি, ইটালি, নেদারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ঔষধ শিল্পে। তবে বেশির ভাগ চাহিদাই পুরণ হয় স্যালাগ্যাসি থেকে এবং

সামান্য পরিমাণে ভারতবর্ষ ও মোজাম্বিক থেকে। ভিনব্লাসটিন সালফেটের মূল্য কেজি প্রতি পঞ্চাশ লক্ষ এবং অ্যাজমালিসিন বা রাউবেসিনের দাম কেজি প্রতি বিশ থেকে ত্রিশ হাজার মত। ভারতবর্ষে যদি নয়নতারা থেকে এই ভেষজ রাসায়নিক-গুলো তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের দেশ ঔষধশিল্প বিশেষ লাভবান হবে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে সর্পগন্ধা ভেষজ উদ্ভিদ নামে খ্যাত। বিখ্যাত প্রাচীনগ্রন্থ চরক সংহিতাতে সর্পগন্ধার উল্লেখ রয়েছে ভেষজ হিসাবে। বৈজ্ঞানিক নাম **রাওভোলফিয়া সার্পেনটিনা** (Rauvolfia serpentina)। 1950 খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক মুলার এই গাছের শিকড় থেকে বিশেষ কার্যকর রাসায়নিক পদার্থটি বা অ্যালকালয়েডটি আবিষ্কার করেন। এর নাম দেন 'রিসারপিন'। এই রিসারপিন আবিষ্কারের পরই সারা বিশ্বে সর্পগন্ধার নাম বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রিসার্পিনের ব্যবহার সর্পগন্ধার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। বিভিন্ন দেশের ঔষধ ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে এই ভেষজটির ওপর। মুশকিলের ব্যাপার হল সর্পগন্ধা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই জন্মায়। গণ্ডারের আত্ম-রক্ষার অস্ত্র যেমন গণ্ডারের ধ্বংসের কারণ হয়েছে ঠিক তেমনি সর্পগন্ধার শিকড়ের ভেষজ গুণাবলী এর চরম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে ব্যাপক উৎপাটনের ফলে এই মূল্যবান উদ্ভিদটি এর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অদৃশ্য হওয়ার মুখে। 1955 সালে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার সর্পগন্ধার রপ্তানী বন্ধ করে দেন। এবং গাছটি বন্য পরিবেশে হয় তাই গবেষণার মাধ্যমে সর্পগন্ধা চাষের দিকে নজর দেন। বিদেশে রপ্তানী বন্ধ হওয়ার ফলে ঔষধ শিল্পে রিসার্পিন তৈরির ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সর্পগন্ধার বিকল্প খুঁজে বার করবার প্রতিযোগিতা শুরু হয় বৈজ্ঞানিক মহলে। সন্ধান মেলে রিসার্পিনের। সর্পগন্ধার নিকট আত্মীয় রাওভোলফিয়া ট্রেটরাফাইলা আমেরিকাতে এবং রাওভোলফিয়া ভোমিটরিয়া আফ্রিকাতে সামাল দেয় সর্পগন্ধার অনুপস্থিতি।

বিগত পঁচিশ বছর ধরে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় সর্পগন্ধা চাষের জন্য তৎপর হন। হিমালয়ের দেরাদুনে, উত্তর প্রদেশের লালকুনা ও হলদিয়ানিতে, বিহারের হাজারিবাগে, তামিলনাড়ুর নীলগিরি ও আন্না-মাল্লিতে, কেরালার কালরিতে, আসামের নওগং, গোয়ালপাড়া, জোড়হাটে, মেঘালয়ের তুরা এবং নাংপুতে, পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গোতে এবং জম্মু কাশ্মীরের জম্মুতে সর্পগন্ধার চাষ হচ্ছে। 30 টন মত সর্পগন্ধার শুষ্ক মূল বর্তমানে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু রিসার্পিন এবং অন্যান্য হাইপোটেনসিভ অ্যালকালয়েডের প্রয়োজন আমাদের দেশে বছরে 200 kg. মত। অর্থাৎ 50 টন মত শুষ্কমূল প্রয়োজন। এছাড়াও বিদেশে এর চাহিদা প্রচণ্ড। বাৎসরিক 100—150 টন শুষ্ক সর্পগন্ধার মূল উৎপন্ন করতে পারলে সাময়িক প্রয়োজন মেটে। অতএব প্রয়োজন আরও ব্যাপক হারে চাষ করার।

ঔষধশিল্পে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে সক্ষম আফিম। আফিম পাওয়া যায় আফিম (পপি) গাছের ক্যাপসুলের শুকনো ল্যাটেক্স থেকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম **প্যাপাভার সোমনিফেরাম** (Papaver somuiferum)। বলতে গেলে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে ভারত এই আফিম চাষে এবং ওপিয়াম অ্যালকালয়েড প্রস্তুতের ক্ষেত্রে।

এই ওপিয়াম সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ ধরনের নিপুণতার প্রয়োজন কারণ গাছের পাতা, ছাল কি শিকড় নয় যে সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিলেই চলবে। আফিম গাছে ফুল হবার তিন চারদিন পর ঝরে পড়ে। 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে আফিমের ফল বা ক্যাপসুল পূর্ণাঙ্গ হয়। এই সময় সবচেয়ে বেশি দুধের মত ল্যাটেক্স পাওয়া যায়। বিশেষ ধরনের ছুরির সাহায্যে ক্যাপসুলের গা চিরে এই ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিকে ল্যানসিং বলে। সাধারণত দুপুরের দিকে ল্যানসিং করা হয় এবং সারারাতে ল্যাটেক্স বেরিয়ে শুকিয়ে থাকে ক্যাপসুলের গা দিয়ে। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে এই ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা হয় প্লাস্টিক ব্যাগে। সাধারণত চার পাঁচ বার এক একটা ক্যাপসুল থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা হয়। ল্যাটেক্স সংগ্রহ শেষ হলে 20-25 দিন পর ক্যাপসুল সংগ্রহ করা হয় এবং খোলা যায়গায় শুকতে দেওয়া হয়। পরে ক্যাপসুলের ভিতরকার বীজ সংগ্রহ করা হয়। আমরা যে পোস্ত খাই সেটা হল এই আফিম গাছের বীজ।

ওপিয়াম অ্যালকালয়েড মরফিন (9—14%), কোডিন (0·7—2·5%), থিবেইন (0·3—1·5%), নস্কাপিন (5 5—1%) এবং প্যাপাভারিন (1%) থাকে। অন্যান্য জায়গার তুলনায় ভারতবর্ষের ওপিয়ামে থাকে সর্বাপেক্ষা বেশি কোডিন। ওপিয়াম অ্যালকালয়েড সবগুলোই ঔষধ শিল্পে যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য অ্যানালজেসিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে দুঃখের বিষয় ঔষধ শিল্পে ব্যবহার না করে হেরোইনের নেশায় আসক্ত নেশাগ্রস্তদের চড়া দরে হেরোইন যোগানোর জন্য অবৈধ উপায়ে ওপিয়ামকে ব্যবহার করা হয় পৃথিবীর সর্বত্র। পৃথিবীতে আফিম উৎপাদনের প্রধান ছটি কেন্দ্র হল ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, লাওস এবং পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান। ভারতে আইনগতভাবে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে আফিমের চাষ হচ্ছে। বছরে প্রায় 928 টন

ভেষজ উদ্ভিদ আফিম গাছ

ওপিয়াম রপ্তানী করা হয় এবং 4300 লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়।

চোখের ওষুধ অ্যাট্রোপিন ড্রপের কথা আমরা অনেকেই জানি। এই অ্যাট্রোপিন পাওয়া যায় **অ্যাট্রোপা বেলেডোনা** (Atropa belladona) থেকে। হোমিও-প্যাথি ওষুধ বেলেডোনা টিঙ্কচারের নাম অনেকেরই জানা। **অ্যাট্রোপা এ্যাকুমিনাটাকে** (Atropa acuminata) বলা হয় ভারতীয় বেলেডোনা। হিমালয়ের পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে সিমলা এবং হিমাচল প্রদেশের আশেপাশে স্বাভাবিক পরিবেশে **অ্যাট্রোপা অ্যাকুমিনাটা** গাছ জন্মায়।

বেলেডোনার পাতা ও শিকড় ঔষধশিল্পে ব্যবহার করা হয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় ভারতের চাহিদা মেটাতে 70 টন শুকনো পাতা প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে এই চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা ভারতীয় বেলেডোনা ব্যবহার করা হয়েছে নির্বিবাদে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মেটাতে বেলেডোনা স্বাভাবিক পরিবেশে প্রায় নিঃশেষিত। বিগত ত্রিশ বছর ধরে বেলেডোনার চাষ হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। CIMAP (সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব মেডিসিনাল এণ্ড এরোমেটিক প্ল্যাণ্টস্) এর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ভারতীয় বেলেডোনা থেকে বছরে প্রায় 30 টন পাতা ও শিকড় পাওয়া যায়, যা থেকে বছরে 100 kg অ্যাল-কালয়েড পাওয়া যায়। এই উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব উপযুক্ত চাষ এবং বনভূমি থেকে পরিমিত সংগ্রহের মাধ্যমে।

এরকম চেনা-অচেনা বহু গাছই আছে যা ভেষজ হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে—বৌদ্ধভিক্ষু যুবক তার চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন শেষে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে গেলে গুরু তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন আশ্রমের চারপাশে ঘুরে কয়েকটা গাছ আনতে যার কোন ভেষজগুণ নেই। শিষ্য অনেক খুঁজে শূন্য হাতে ফিরে এলেন কারণ এমন কোন গাছ খুঁজে পেলেন না যার কোন ভেষজ গুণ নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জঙ্গল থেকে খুঁজে পেতে শিকড় বাকড় সেবন করে রোগ বালাই দূর করবার কৌশল বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে! আধুনিক কালে ভেষজ গবেষণা বা ভেষজ শিল্পের কথা তাদের জানা নেই তবে বংশানুক্রমে রক্ষিত ভেষজ জ্ঞান তাদের মধ্যে রয়েছে। এর জন্য কোন পড়াশুনো বা গবেষণার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু বর্তমান সমাজের অনিয়ন্ত্রিত বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন প্রকৃতিজাত ভেষজের সুষ্ঠ প্রতি-পালন ও সুনিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেল
28/1A, গরিয়াহাট রোড, কলিকাতা—700029.

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

গুংগা / তপন আদক

প্রকৃতির রানী আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কি মানুষ-জন, কি গাছপালা, কোন জায়গাতেই বৈচিত্র্যের অভাব নেই, তেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায় জীবজন্তু ও পোকা-মাকড়ের মধ্যেও। আন্দামানের গুংগা এক বিচিত্র ধরনের শামুক। সমস্ত ধরনের শামুকই মোলাস্ক (molluscs) জীবের অন্তর্ভুক্ত। গুংগার প্রকৃত নাম জায়েন্ট আফ্রিকান স্নেল বা আফ্রিকান দৈত্য শামুক। জীববিদ্যায় এদের নাম এ্যাচাটিনা ফুলিকা (Achatina fulica)। এরা স্থলচারী। বেশির ভাগ স্থলচারী শামুকই তৃণভোজী। গুংগারা নরম ঘাস, ছোট ছোট গাছের কচিপাতা, গবাদিপশুর মল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। দিনের বেলা এরা পাথর, ঘাসপাতা, আবর্জনা এবং হালকা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে এরা দলবল নিয়ে বেরিয়ে আসে অঙ্কুরিত চারাগাছগুলির মুণ্ডচ্ছেদ করতে।

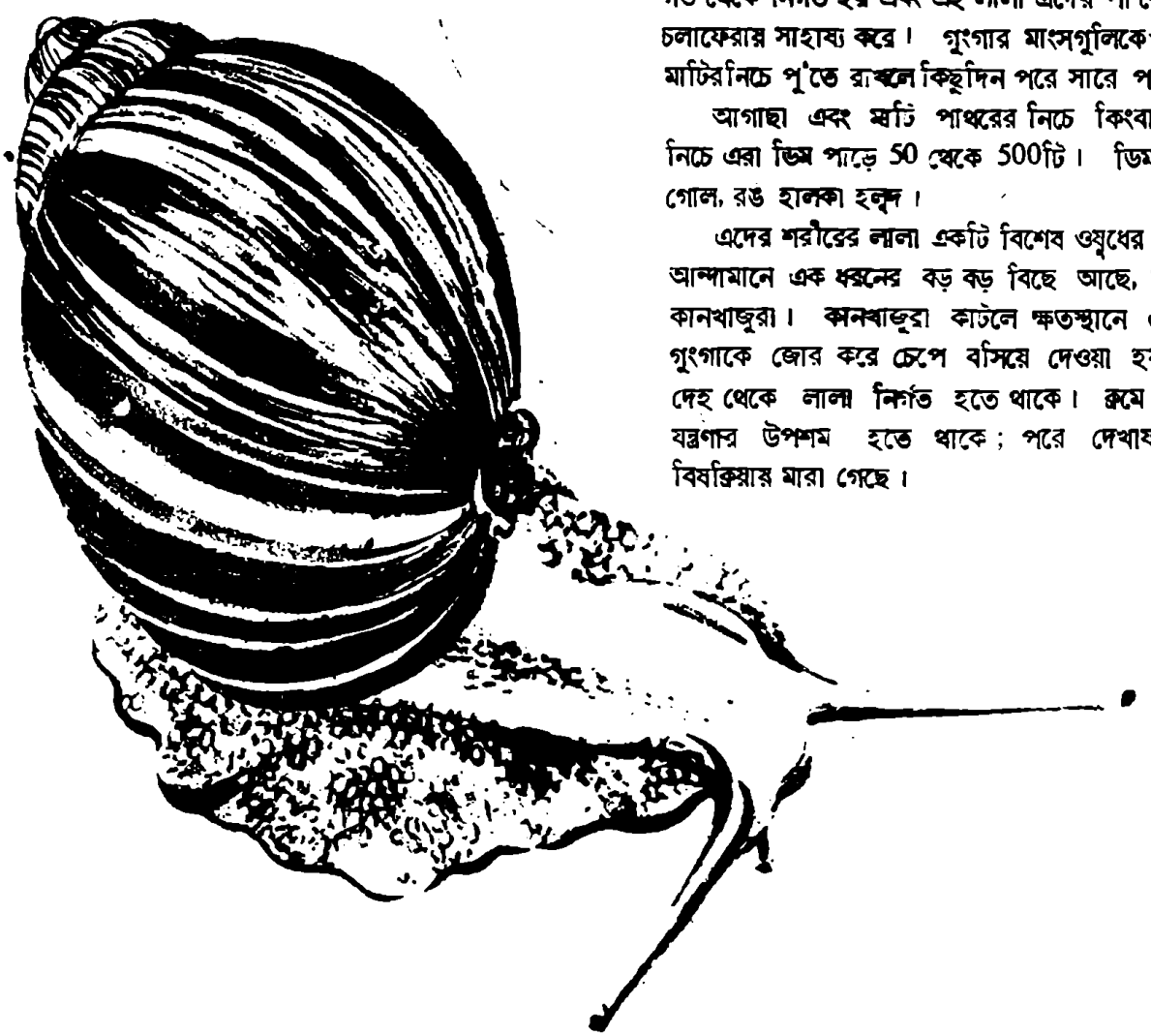

গুংগাদের দেহের আবরণটি হয় গাঢ় বাদামী রঙের। বাদামী রঙের সাথে পাঁচালো সাদা ডোরাকাটা। সাদা রঙের ডোরাগুলির সংখ্যা একই হয় না, কোন শামুকের চারটি করে ডোরাকাটা, আবার কোন কোনটির পাঁচ ছ'টি করে। আবরণের এ ধরনের রঙ এদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। এরা যখন হাঁটে তখন দেহের আবরণের ভিতর থেকে মাথা ও পা বেরিয়ে আসে। মাথায় থাকে দু জোড়া শুঁড়, উপরের জোড়াটি আকারে বড় এবং শুঁড়ের ডগায় থাকে চোখ। এক ধরনের লালা (slime) এদের দেহের পাশের গর্ত থেকে নির্গত হয় এবং এই লালা এদের পা'কে সিক্ত করে চলাফেরায় সাহায্য করে। গুংগার মাংসগুলিকে সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে রাখলে কিছুদিন পরে সারে পরিণত হয়।

আগাছা এবং স্যাঁতি পাথরের নিচে কিংবা আবর্জনার নিচে এরা ডিম পাড়ে 50 থেকে 500টি। ডিমগুলি গোল গোল, রঙ হালকা হলুদ।

এদের শরীরের লালা একটি বিশেষ ওষুধের কাজ করে। আন্দামানে এক ধরনের বড় বড় বিছে আছে, স্থানীয় নাম কানখাজুরা। কানখাজুরা কাটলে ক্ষতস্থানে একটা জীবন্ত গুংগাকে জোর করে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়। গুংগার দেহ থেকে লালা নির্গত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে রোগীর যন্ত্রণার উপশম হতে থাকে; পরে দেখাযায় গুংগাটি বিষক্রিয়ায় মারা গেছে।

অ্যালার্জি কি এবং কেন ?

জয়ন্ত কুমার রায়

মানুষ সহ সব প্রাণীর বহিরাগত ক্ষতিকারক জীবাণু সমূহকে ধ্বংস করার যে শারীরিক ক্ষমতা তাকে বলে অনাক্রম্যতা।

এই 'অনাক্রম্যতা' গুণের একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়াই হল অ্যালার্জি। যেমন ধরা যাক কেউ লিভারের অসুখের জন্য কোন ট্যাবলেট খেল। ফলে ঐ অসুখের অনাক্রম্যতা তার শরীরে তৈরি হল ও রোগ সারল কিন্তু ঐ সংগে সংগে কিছু উপসর্গ যেমন ত্বকে ফুসকুড়ি, রক্তচাপের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি অসুস্থতা দেখা যায়।

অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু :—দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু ঔষধ, ত্বক প্রসাধন সামগ্রী, খাদ্যবস্তুর প্রোটিন, বহিরাগত জীবাণু, ফুলের রেণুকণা, বিষাক্ত লতাবিশেষ প্রভৃতি।

অ্যালার্জির কারণ :

অ্যালার্জি প্রধানত : দুইটি কারণে হতে পারে—

[এক] রক্তের লিম্ফোসাইট নামক শ্বেতকণিকা যখন অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন তা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে এবং কিছু বিশেষ প্রকৃতির রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যার থেকে দেহকোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে ও শুরু হয় অ্যালার্জির নানান উপসর্গ।

[দুই] যখন বহিরাগত জীবাণু দেহে প্রবেশ করে তখন রক্তে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এই অ্যান্টিবডিগুলির নাম হল—IgG, IgA, IgM, IgD এবং IgE এই বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডিগুলি বহিরাগত জীবাণু ধ্বংস করতে সিদ্ধহস্ত। এক বিশেষ অবস্থায় IgG বা IgE অ্যান্টিবডি যখন বহিরাগত জীবাণুর সংগে বিশেষ রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে ও তা রক্তবাহতে সঞ্চিত হওয়ার ফলে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি।

বংশগতি ও অ্যালার্জি : অনেকের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি একটি বংশগত রোগ। এই সব ক্ষেত্রে শরীরের IgE অ্যান্টিবডি বহিরাগত জীবাণুর সংগে যুক্ত হয়ে রক্তের বেসোফিল নামক শ্বেতকণিকার সংগে যুক্ত হয়। এর ফলে ঐ বেসোফিল কণা কিছু বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যা অ্যালার্জি সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ ধরনের অ্যালার্জি ও তার কারণ :

[এক] **বিষফোড়া**—মেষ ও গবাদি পশুর দেহে এই ধরনের অ্যালার্জি দেখা যায়। কারণ আর কিছুই নয় রক্তের অ্যান্টিবডি ও বহিরাগত জীবাণুর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া।

[দুই] **হাঁপানি**—আমাদের নাকের মধ্য দিয়ে ফুসফুসে যখন রেণুকণা প্রবেশ করে তখন তা রক্তের IgA অ্যান্টিবডির সংগে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এই উপসর্গের সৃষ্টি করে।

[তিন] **রক্তমস্ত অসুস্থতা বা Serum Sickness :**

দেহে যখন সিরাম বা পেনিসিলিন ইন্‌জেশান করা হয় তখন রক্তের IgG অ্যান্টিবডির সংগে সিরামের প্রোটিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে সারা শরীর ফুলে যায়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

[চার] **ত্বকের ফুসকুড়ি :** ত্বকে প্রসাধন লাগালে বা ত্বক বিষাক্ত লতাপাতার সংস্পর্শে এলে এই ধরনের অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। এর কারণ হল এই যে যখন ত্বকের নিচের স্তরের লিম্ফোসাইট কণিকা ঐ সব বস্তুর সংগে বিক্রিয়া করে তখন অন্যকিছু কোষ ঐ বিক্রিয়াস্থলের দিকে আকৃষ্ট হয় যার ফলে ত্বক ফুলে উঠে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অ্যালার্জি দৈনন্দিন জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণতঃ অ্যালার্জি চিকিৎসা করলেই সেরে যায় কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যালার্জি প্রাণনাশেরও কারণ হয়।

17 নং বিধান সরণী, কলিকাতা —700006

ভোল্টেজ রেগুলেটর-এর গোড়ার কথা

সৌমেন চক্রবর্তী

কোনও electronic যন্ত্র চালাতে গেলে একটা Power Supply—এর প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই Supply একটা Voltage Source। একটা আদর্শ Voltage Source তার দুই প্রান্তের ভিতর একটা নির্দিষ্ট তড়িৎ-বিভব রাখে, যা current I_L —এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

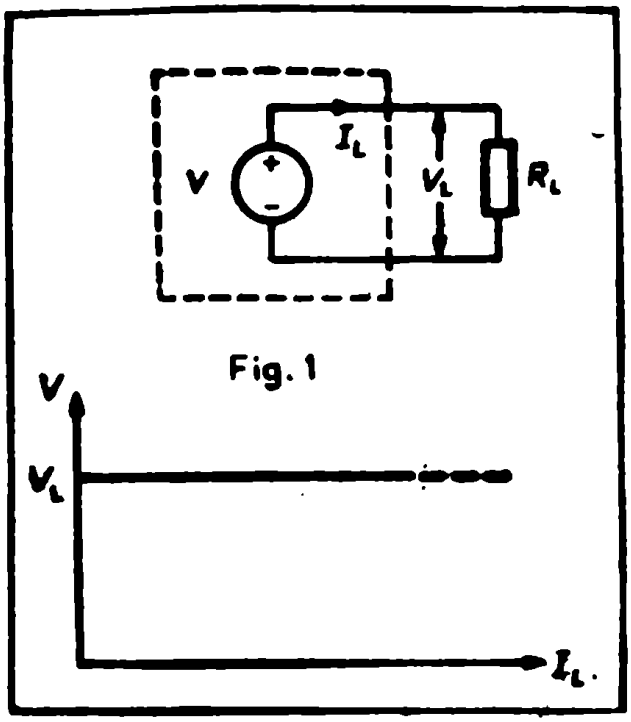

অর্থাৎ R_L— এর মান যাই হোক না কেন, V_L অপরিবর্তিত থাকবে! অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে Short circuit এড়াতে I_L—এর একটা সর্বোচ্চ মান বেঁধে দেওয়া দরকার। একে Overload বা Short-circuit Protection বলে।

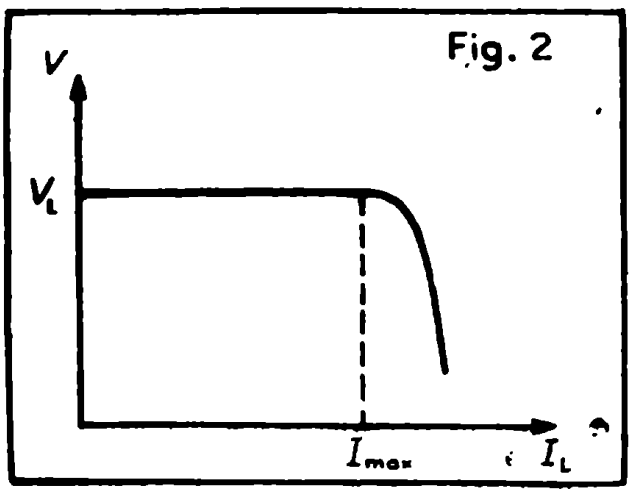

বাস্তবে Voltage Source কে এইভাবে দেখানো যায়ঃ

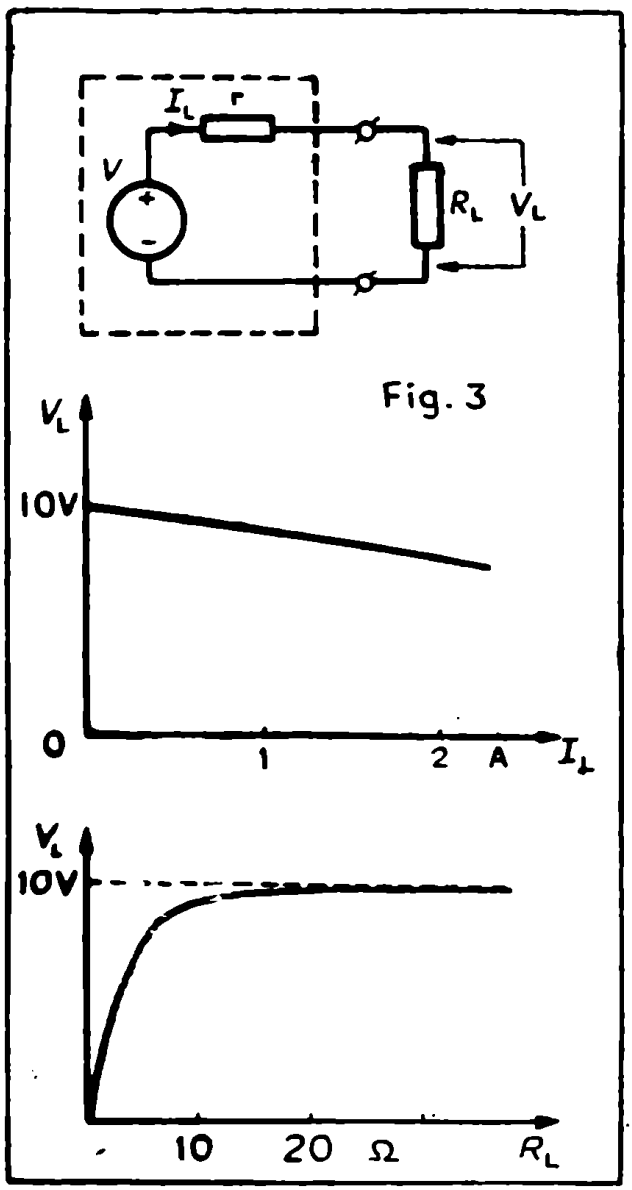

আদর্শ উৎস থেকে বাস্তব Voltage Source-এর পার্থক্য ঃ

(1) V-এর মান সময়ের সঙ্গে পাল্টায় যেমন battery পুরোন হলে V ক্রমশঃ কমতে থাকে। অথবা mains Voltage-এ হেরফের হলে একটা eliminator-এর বিভবও পাল্টাতে থাকে।

(2) V-এর সঙ্গে Series-এ internal resistance এর উপস্থিতি। এর ফলে,

$$I_L = \frac{V}{r+R_L} \quad ; \qquad V_L = \frac{VR_L}{r+R_L}$$

কিছু সংখ্যা নিয়ে লেখচিত্র এঁকে দেখা যাক ঃ

$V = 10V$, $r = 1\Omega$। এবার R_L কে অসীম মান (∞)

থেকে কমিয়ে আনলে এরকম দুটি লেখচিত্র পাওয়া যাবে। সমীকরণটি এইরকম : $V_L = V - I_L r$

অনেক electronic যন্ত্রের জন্য স্থির ও অপরিবর্তনশীল বিভব প্রভেদের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে Voltage regulator ব্যবহার করা দরকার। এই রচনায় কেবল series linear regulator নিয়ে আলোচনা করা হবে।

নিচে আঁকা বর্তনীতে R হচ্ছে regulator এবং R_L হচ্ছে load। R-এর কাজ হচ্ছে R_L ও V_1-এর সাথে সাথে এমনভাবে নিজের মান বদলানো যাতে R_L-এর দুই প্রান্তের মধ্যে স্থির বিভব V_L বজায় রাখা যায়।

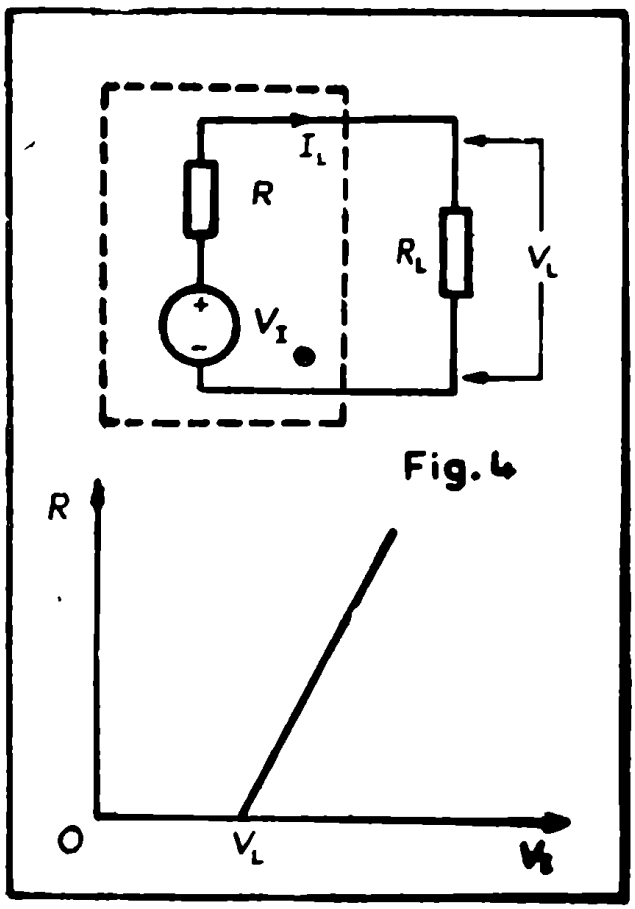

Fig. 4

সমীকরণ লিখলে দাঁড়ায়—

$$I_L = \frac{V_L}{R_L}$$

$$V_1 = V_L + R\frac{V_L}{R_L}$$

$$\therefore R = R_L\left(\frac{V_1 - V_L}{V_L}\right)$$

V_1-এর সঙ্গে R-এর পরিবর্তন একটি লেখচিত্র দিয়ে সুন্দর করে বোঝানো যায়।

লেখটি একটা সরলরেখা। তাই এধরনের regulator কে linear regulator বলা হয়।

এবার কিছু বাস্তব regulator নিয়ে আলোচনা করি। নিচের ছবিতে op-amp ব্যবহার করে একটি বর্তনী আঁকা হয়েছে।

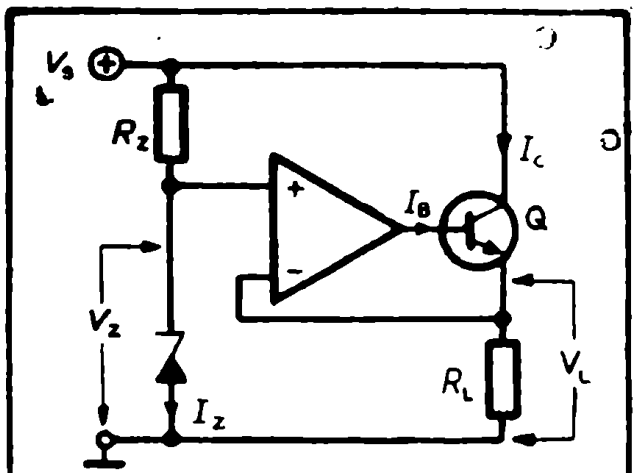

Fig. 5

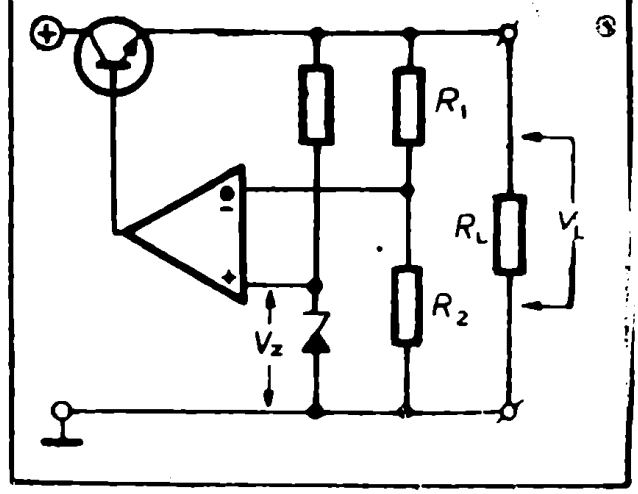

এই বর্তনীতে Zener diode-এর সাহায্যে op-amp এর non-inverting input ('+' চিহ্নিত) এ একটা স্থির বিভব V_Z সৃষ্টি করা হয়েছে যেটা reference-এর কাজ করছে। op-amp I_B কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে যাতে '+' ও '—' input-এর মধ্যে শূন্য বিভব পার্থক্য থাকে।

সাধারণ op-amp এর output থেকে বেশি current নেওয়া উচিত নয়, তাই transistor θ ব্যবহার করা হয়েছে। V_S যদি 12 থেকে 15V পর্যন্ত হয় তাহলে LM 741 op-amp ও θ-এর জায়গায় যে কোনও Silicon NPN transistor ($\beta > 50$) ব্যবহার করা যেতে পারে। I_L যদি 0·5A-এর কম হয় তাহলে θ-এর জায়গায় BD 137 ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি 400mW zener ব্যবহার করা হয়,তাতে সাধারণত 300 mW-এর বেশী

dissipate করা উচিত নয়। অতএব, $V_z I_z = 0{\cdot}3$

$$\therefore\ I_z = \frac{0{\cdot}3}{V_z} = \frac{Vs - V_z}{R_z}$$ [Fig—5 দ্রষ্টব্য।]

$$\therefore\ R_z = \frac{V_z\,(Vs - V_z)}{0{\cdot}3}\ \Omega$$

এই বর্তনীর একটা খুঁত হচ্ছে এই, যে V_z বিভব I_z-এর উপর কিছুটা নির্ভরশীল। সুতরাং Vs ওঠানামা করলে V_z একেবারে স্থির থাকবে না। একটু বুদ্ধি খরচ করলে এই দোষটা সুন্দরভাবে দূর করা যায়। পরিবর্তিত বর্তনী Fig. 5 এর নিচের অংশে দেখানো হয়েছে।

I_+ ও I_- যেহেতু বেশিরভাগ op-amp-এর জন্যেই খুব কম, সেহেতু

Fig. 6

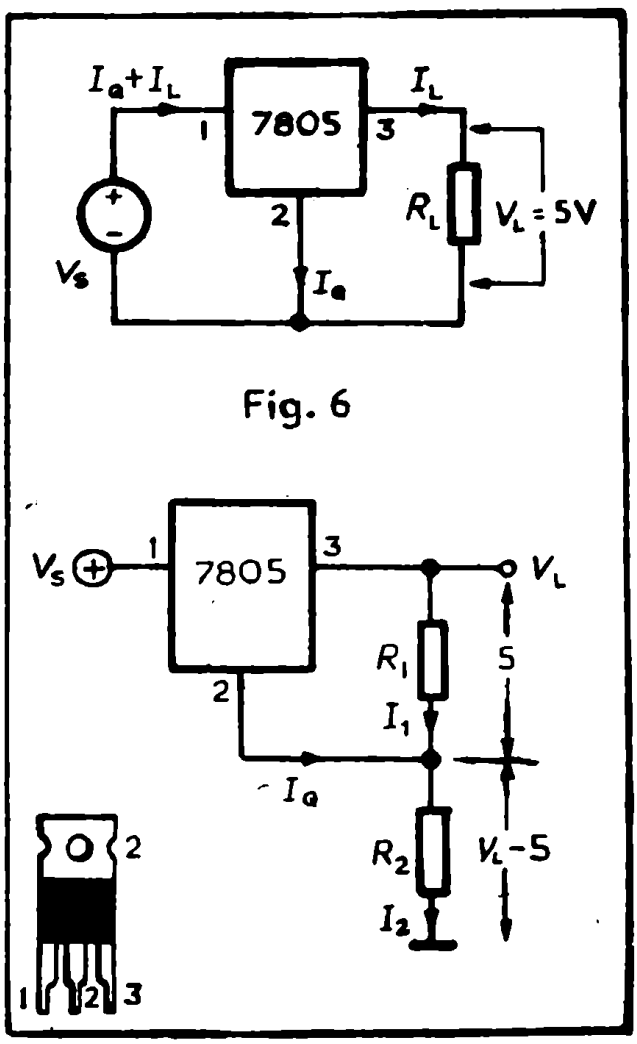

$$V_L\left(\frac{R_2}{R_2 + R_1}\right) = V_z$$

বা $V_L = V_2\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$

সবশেষে আরেকরকম regulator-এর কথা বলা যাক। এটা একটা integrated circuit বা IC, LM 7805। এটা 5V regulated supply দেবার জন্য তৈরি।

এটাকে কিন্তু একটু অন্যভাবে ব্যবহার করলে কিছুটা বেশি output পাওয়া যায়। বর্তনী থেকে বোঝা যাচ্ছে,

$$I_2 = I_1 + I_Q$$

অর্থাৎ $\frac{V_L - 5}{R_2} = \frac{5}{R_1} + I_Q$

I_Q সাধারণত মাত্র কয়েক mA হয়, সুতরাং I_1 ও I_2 যদি তার তুলনায় যথেষ্ট বেশি হয় তাহলে ওপরের সমীকরণে I_Qকে গণ্য না করলেও চলে। সেক্ষেত্রে

$$\frac{V_L - 5}{R_2} = \frac{5}{R_1}$$

অথবা $V_L = 5\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

এই সমীকরণ ব্যবহার করে একটা সুন্দর variable regulated supply তৈরি করা সম্ভব। এতে 1 KΩ Potentiometer এদিক-ওদিক করে V_L কে 5v ও 12V-এর মধ্যে বাড়ানো-কমানো যায়।

Fig. 7

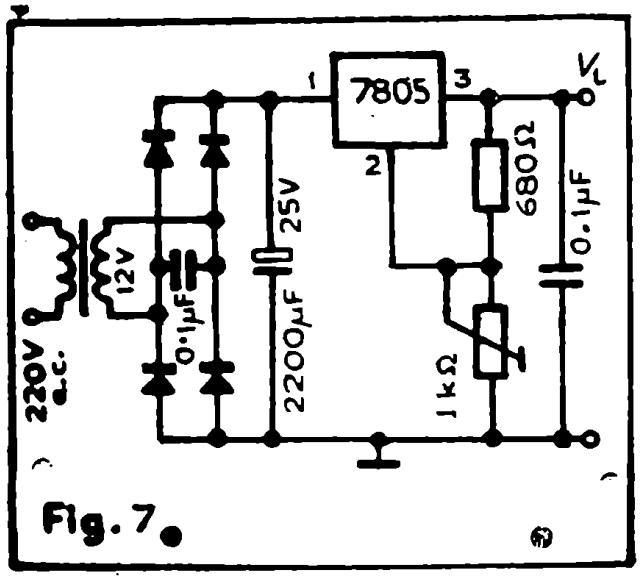

Rectifier হিসেবে চারটে IN 4007 ব্যবহার করতে হবে। Lm 7805 IC-র জন্য 3cm × 3cm × 2mm aluminium heat-sink দরকার। Heat sink যেন chassis-ground-এর সঙ্গে লাগানো না হয়। কেননা এই circuit-এ প্রান্ত '2' কিন্তু ground-এ নেই। বর্তনীটাকে venoboard বা PCB-র উপর assemble করা চলে। potentiometer-এর knob-এর নিচে dial এঁকে প্রথমবার V_L voltmeter দিয়ে মেপে calibrate করতে হবে। তারপর knob ঘুরিয়ে 5v থেকে প্রায় 12v পর্যন্ত V_L-কে বাড়ানো-কমানো যাবে।

সৌমেন চক্রবর্তী – আই. আই. টি. খড়্গপুর।

অরণ্যের আত্মা

নিরঞ্জন সিংহ

অনেকদিন পর দেশে ফিরে একটা অদ্ভুত খবর শুনে বেশ অবাক হলাম। দেশ বলতে শেয়ালদা থেকে ট্রেনে ঘণ্টা চারেকের পথ। আমাদের গ্রামের স্টেশনে ঢোকার আগে ট্রেনগুলো গমগম শব্দ করে একটা লম্বা রেল-সেতু পার হয়। সেতুটি ইচ্ছামতীর নদীর উপর। সেতুর বাঁ দিকে তিনটি নদীর সঙ্গম। উত্তরে মাথাভাঙা, দক্ষিণে চূর্ণী আর ইচ্ছামতী। রেল লাইনের ধার থেকে মাথাভাঙার পাড় ঘেসে ভাদুড়ীদের বিশাল বাগান। ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম তখন মাঝে মাঝেই আমরা দল বেঁধে এই বাগানে অভিযান চালিয়েছি ; কিন্তু তবু এই বাগানের খুব সামান্য অংশই আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম বলে আমার ধারণা। বড়রা কখনই আমাদের এ ধরনের অভিযান ভাল চোখে দেখেন নি। বাঘ, সাপ ছাড়াও ওই বিশাল বাগানের গভীর অঞ্চলে নাকি বাস ছিল সব অশরীরীদের। অশরীরীরা অবশ্য আমাদের কোন দিন দেখা দেন নি, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বরাবরই একটু সন্দেহ ছিল।

এবার দেশে ফিরে শুনলাম ভাদুড়ী-বাগানের মধ্যে অনেকেই এক অশরীরীকে দেখতে পেয়েছে। এর চেহারা একটি ছোট ছেলের মত। ভাদুড়ী বাগানের বিভিন্ন জায়গায় তাকে নাকি দেখা গেছে। ওই বাগানের মধ্যে যারা কাঠ কুড়োতে বা কাঠ কাটতে গেছে তারা ওই ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছে। আরো মজার ব্যাপার এই যে যারা বাগানে পাতা বা শুকনো ডালপালা কুড়োতে গেছে তারা ছেলেটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছে। ছেলেটি তাদের কোন ক্ষতি করেনি, কিন্তু যারা গাছ বা গাছের ডালপালা কাটতে গেছে তাদের দিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটি তাকিয়েছে যে তারা ভয়ে আতঙ্কে ভাদুড়ী বাগান থেকে পড়িমরি করে ছুটে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ছেলেটি যে অশরীরীদেরই কেউ এ বিষয়ে দেখলাম গ্রামের লোকদের কোন সন্দেহই নেই। কারণ, মানুষ হলে ওইটুকু ছেলে ওই গভীর জঙ্গলে সারাদিনরাত কোন সাহসে ঘুরে বেড়ায়? প্রাণের ভয় নেই? খাওয়া-থাকার চিন্তা নেই?

দু'চারজন আরো সংযোজন করল যে তারা দেখেছে ওই গভীর জঙ্গলের যে সব জায়গায় গাছ মরে গিয়ে কিছুটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সেইসব ফাঁকা জায়গায় ছেলেটি নতুন চারাগাছ লাগিয়েছে। এরকম অদ্ভুত এবং বিচিত্র অশরীরীকে নিয়ে গ্রামে যে আলোড়ন পড়ে যাবে এতো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের গ্রামের কবি সদানন্দ ওই বিচিত্র অশরীরীর একটা নামকরণও করে ফেলেছে ; নামটা হচ্ছে "অরণ্যের আত্মা"। সদানন্দর মত হচ্ছে এরকম নাকি হয় —বিশাল ও গভীর অরণ্যের একটা নাকি অশরীরী আত্মা থাকে। সদানন্দকে গ্রামের লোক মোটেও পাত্তা দেয় না। ওর কবি-প্রতিভার সমাদর করার বদলে ওকে পাগল বলে মনে করে ; সুতরাং পাগলের কথায় কেউ কান দেয় না।

এরকম ঘটনা ঘটা কি সত্যিই সম্ভব? কিন্তু এতগুলো লোক যখন বলছে তখন তার মধ্যে কিছু সত্যি নেই তাই বা মানি কি করে? তাই মনে মনে ঠিক করলাম, আমি নিজেই একবার সরেজমিনে তদন্ত করে আসবো। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোটবেলার অভিযানের রোমাঞ্চের মত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

আমার সংকল্পের কথা শুনে সহপাঠী বন্ধু শান্ত বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওই বুনো জঙ্গলে তুই ভূত দেখতে যাবি?'

বললাম, 'হ্যাঁ যাব।'

শান্ত বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'ভূতে যদি ঘাড় মটকায়?'

বললাম, 'এ পর্যন্ত যখন কারো ঘাড় মটকায় নি তখন আমার ঘাড়ও আস্তই থাকবে।'

'যা ভাল বুঝিস কর। তবে ভূতে ঘাড় না মটকালেও সাপখোপের ভয় নেই তা যেন মনে করিস নে।' শান্ত শেষবারের মত আটকাবার চেষ্টা করল।

বললাম, 'ভাবিস নে, সাবধানে যাব।'

বহুকাল বাদে আবার সেই ভাদুড়ী বাগানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাগানের দিকে তাকিয়ে মনে হল কোথায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভাদুড়ী বাগান এক কালে দুর্ভেদ্য জঙ্গল বলে পরিচিত থাকলেও এখন যেন আর সেরকম নেই বলে মনে হল। লোকালয় এগিয়ে এসেছে ভাদুড়ী-বাগানের প্রান্ত পর্যন্ত। বাগানের রহস্যময়তা যেন এতে অনেকখানি কমে গেছে। অথচ এই বাগানের মধ্যেই ঘটছে নাকি সব অদ্ভুত ঘটনা। আমার মনের মধ্যেও দেখা দিল একটা সন্দেহের দোলা! আমার সন্দেহ যে কতখানি মিথ্যে ছিল তার প্রমাণ মিলল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ভাদুড়ী-বাগানের একপ্রস্ত চিরে পীচের রাস্তা এগিয়ে গেছে কৃষ্ণগঞ্জের দিকে। আমি এই পীচের রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে বাঁদিকে নেমে একটা সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম। গাছে গাছে নানারকম পাখি ডাকছে। বাগানের মধ্যে বড় বড় গাছ যেমন আছে, তেমনি আছে ছোট ছোট ঘন ঝোঁপ। ঝোঁপের উপর নানারকম লতা। বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটে রয়েছে ঝোঁপের মাথায়। মিনিট কয়েক হাঁটবার পরই মনে হল আমি যেন কোন গভীর অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর কী এক আকর্ষণে আরো ভিতরের দিকে এগিয়ে চললাম। যদি অলৌকিক বা অশরীরী কিছু দেখতেই হয় তাহলে অরণ্যের গভীরে ঢুকতেই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম সেখান থেকে চিৎকার করলেও বাইরে থেকে কেউ শব্দ শুনতে পাবে না। এতক্ষণ পরে সত্যি আমার গাটা ছমছম করে উঠল।

একটু হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় খুব হাল্কা একটা শব্দ আমার কানে এলো! মনে হল কেউ যেন খুব হাল্কা পায়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে চলে গেল। এবার একটু ভয় পেলাম!

আমার চারিদিকে এখন বড় বড় গাছ। আম, সেগুন, আমলকি প্রভৃতি বহু রকমারী গাছের মেলা। গাছগুলোর মাথা দুলছে। অথচ খুব যে একটা হাওয়া বইছে তা নয়। গাছগুলো শাখাপ্রশাখা দুলিয়ে আমাকে যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে আমার সমস্ত মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এ অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। ভীষণ অবাক হলাম। ভয় কেটে গেল। নিজের অজান্তেই এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের বিশাল গুড়িকে আলিঙ্গন করলাম। মনে হল আমি কোন গাছের গুড়িকে আলিঙ্গন করছি না, তার বদলে আমি যেন বহুদিন বাদে আমার কোন এক পরমাত্মীয়কে কাছে পেয়ে আলিঙ্গন করছি।

আমি এখন পুরোপুরি শহুরে মানুষ। আমার মনে এখন যুক্তিহীন আবেগের কোন স্থান নেই বললেই চলে। আমার জীবনে এরকম একটা গভীর আবেগময় মুহূর্ত কোনদিন আসতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কতক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম সঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ একটা ছোট্ট দুষ্টুমিভরা মুখ গুঁড়িটার পিছন থেকে উঁকি মারতেই আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। সামনে এ আমি কাকে দেখছি? এই কি সদানন্দের সেই "অরণ্যের আত্মা"? কিন্তু এতো কোন বায়বীয় বা অশরীরী জীব নয়। দেখে তো স্পষ্ট মনে হচ্ছে ছেলেটি রক্তমাংসের মানুষ। তবে!

অপলকে ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সরল নিষ্পাপ মুখ। বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে হবে। রোগা। খালি গা, খালি পা। পরণে শুধু একটা জীর্ণ হাফ-প্যান্ট। নিজেকে সামলে নিয়ে একটু গার্জেনী ভঙ্গিতে বললাম, তোমার কথা শুনেছি। তোমাকে দেখতেই এখানে এসেছি। কে তুমি? এই গভীর জঙ্গলে একা একা তুমি কী করছ?'

'আমি তো একা নই।' আশ্চর্য, ছেলেটির মুখ নড়ল না, কিন্তু আমি কথা কটি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। না, শুনতে পেলাম বললে ভুল হবে, বরং বলা উচিৎ বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ মনে মনে কথা—টেলিপ্যাথী। তাহলে ছেলেটি তো আমাদের পৃথিবীর মানুষ নয়। হয়তো অন্য সৌর-মণ্ডলের কোন গ্রহের অজানা জীব।

আমার ভাবনা শেষ হতেই মনে মনে জবাব পেলাম আপনার ধারণাই ঠিক।

এবার আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জেগে উঠল।

ছেলেটি জানালো প্রশ্নগুলো একে একে করতে, তা না হলে ও বুঝে উত্তর দিতে পারবে না।

ভিন গ্রহ থেকে এসে আমাদের পৃথিবীর একটা গ্রামের গভীর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কী করছ ?

গাছপালা বাঁচাবার চেষ্টা করছি। জবাব পেলাম।

এর জন্যে তুমি তোমাদের গ্রহ থেকে আমাদের পৃথিবীতে এসেছো ?

হ্যাঁ। কারণ, গাছপালা বাঁচানোই এখন আমার জীবনের ব্রত।

সে তো তোমাদের নিজের গ্রহে থেকেই করতে পারতে।

আমাদের গ্রহে যে আর কোন গাছ নেই। কোন গাছ জন্মাবার মত পরিবেশও নেই। অরণ্য ধ্বংস হলে জীব-জগতও যে ধ্বংস হয় একথা আমরা অনেক মূল্য দিয়ে বুঝেছি।

সে কথা ঠিক। এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি তার অগণিত সন্তানদের জন্য কোল পেতে দিয়েছেন। অদৃশ্য জীবাণু থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান মানুষের বাস এখানে, সেই সঙ্গে উদ্ভিদ এবং পক্ষিকুল। এইসব মিলেমিশে সুস্থ আব-হাওয়ায় বেঁচে থাকবে এবং বংশবৃদ্ধি করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই হচ্ছে প্রকৃতির ইচ্ছে। এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রাখতে পারলে জীবনের অগ্রগতি হয়ে যাবে রুদ্ধ।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাদের সৌরমণ্ডল থেকে আমাদের সৌরমণ্ডলের দূরত্ব প্রায় ছ' আলোকবর্ষ। আমাদের গ্রহটিও ছিল আপনাদের পৃথিবীর মতই সবুজ শস্যশ্যামলা। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা। কারণে অকারণে ধ্বংস করা হল দেশের অরণ্য সম্পদ। তার ফলও ফলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমল, ভূমিক্ষয় শুরু হল এবং কয়েক বছরের মধ্যে গ্রহের স্থলভাগকে গ্রাস করল মরুভূমি। শস্যহীন, বৃক্ষহীন মহাশ্মশানে পরিণত হল আমাদের পৃথিবী। অন্যান্য জীবসহ মানুষও নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করল। তখন একদল দুঃসাহসী বিজ্ঞানী দ্রুতগতি সম্পন্ন মহাকাশযানে চেপে ভেসে পড়ল মহাকাশে। সঙ্গে নিল জীবিত মানুষদের। এরপর যেখানেই তারা আমাদের গ্রহের মত গ্রহের সন্ধান পেল সেখানেই আমাদের মত দু' দশটা করে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে গেল সেই পৃথিবীর অরণ্যানী রক্ষা করবার জন্য। আমরা আর কোনদিনই আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব না। আপনাদেরও যাতে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে না হয় তারই জন্য আমরা আপনাদের অরণ্যরক্ষায় ব্রতী হয়েছি।

একটানা ভাবনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আমার মনে। ও থামতেই আমি বললাম, তুমি হয়তো জেনে খুশি হবে যে এ সমস্যাটা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। এ সম্পর্কে আমরা প্রচুর লেখালিখি করছি। তাছাড়া আমরা খুব সমারোহের সঙ্গে বনমহোৎসব পালন করে থাকি।

ছেলেটি যেন একটু মুচকি হাসল। জানি। কিন্তু উৎসব তো বছরের সবদিন হয় না। কোন একটি বিশেষ সময়ে উৎসব হয়, তারপর সে উৎসবের কথা সবাই ভুলে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত মিলিয়ে নিতে হবে। যাকে রাখো সেই রাখে। আপনাদের পৃথিবীরই প্রবাদ। এইসব জীবন্ত বৃক্ষরাজিকে গভীরভাবে ভালবাসতে শিখুন, আপন আত্মীয় ভাবতে শিখুন, তাহলে ওরাও আপনাদের উপকার করবে। সৃষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকবে। মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এই গ্রহে। আমাদের মত গ্রহহারা হয়ে ভেসে বেড়াতে হবে না।

আমার মনে হল এই ভিন গ্রহবাসী ছেলেটির কথা অবহেলা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও জল-স্থল-আকাশকে পরিপূর্ণভাবে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন জল-স্থল-আকাশ ব্যপ্ত হয়ে এক জীবনচক্র চলছে। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...

আমি কিছু বলার জন্য ছেলেটির দিকে মুখ তুলে তাকালাম। কিন্তু ওকে আর দেখতে পেলাম না। চমকে উঠে গাছের ওপাশে ছুটে গেলাম, কিন্তু ওকে পেলাম না। আশে পাশে পাগলের মত খুঁজতে লাগলাম ছেলেটিকে ; কিন্তু খুঁজে পেলাম না। গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে দীর্ঘশ্বাসের মত হাওয়া বয়ে গেল। অরণ্যের আত্মার দীর্ঘশ্বাস ! এক ঘরছাড়া শিকড়হীন অস্তিত্বের হাহাকার আমার হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করল। আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনের গাছটাকে আলিঙ্গন করে ভাদুড়ী-বাগান থেকে ক্লান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লাম। হৃদয়ের গভীরে ধ্বনিত হতে লাগল অরণ্যের আত্মার কথা-গুলো। মনে হল ভাদুড়ী-বাগানের বৃক্ষরাজি সত্যিই আজ আমার পরমাত্মীয় !

7/4, W2C, Ph-II, Golf Green, Cal-45.

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত নবম ও দশম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়
তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

অভিজিৎ সরকার

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ মহাকাশের সুদূর নীলিমাকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলেছে : "খোলো খোলো, হে আকাশ স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।" মহাকাশের অনাবিষ্কৃত রহস্যাবলী যেন অবিরত মানুষকে আকর্ষণ করে চলে। তাই কবি বলেছেন—

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

আকাশের আহ্বানে নক্ষত্রের ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষের পথিক সত্তা কেবলই দূর থেকে আরও দূরে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলে; মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে চলে তার নিরলস প্রচেষ্টা। পরে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার মহাকাশ গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

আমাদের ভারতবর্ষও মহাকাশ গবেষণায় বিশেষ পিছিয়ে নেই। অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারত মহাকাশ-গবেষণায় গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। অবশ্য তখনকার মহাকাশ গবেষণা প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর্যভট্ট ছিলেন সেই প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদেশী ইংরেজ শাসকরা নিজস্বার্থে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মহাকাশচর্চায় উৎসাহ না দেওয়ায় নবীন ভারত মহাকাশ গবেষণায় প্রাচীন ভারতের গৌরবময় উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

স্বাধীন ভারত সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণার যে বিপুল আয়োজন করেছে তা একদিকে যেমন তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি আবার অগ্রগতিশীল দুনিয়ার সঙ্গেও একসূত্রে গাঁথা। আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক মহাকাশ গবেষণায় ভারত প্রথম প্রবেশ করল 1962 খ্রীস্টাব্দের 16ই ফেব্রুয়ারী। এই দিনে স্থাপিত হল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ।" কিছুকাল পরে মহাকাশ গবেষণাকে পারমাণবিক শক্তি বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, নতুন দিল্লীর "ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্সেস'-এর সঙ্গে এর সংযোগ ঘটে। 1969 এর 15ই আগস্ট থেকে ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন" (ISRO) ভারতের মহাকাশ গবেষণার যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এরপর 1972 খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হল "দি ডিপার্টমেণ্ট অব স্পেস অ্যাণ্ড দি স্পেস কমিশন।" এছাড়া ভারতের থুম্বা, আমেদাবাদ, শ্রীহরিকোটা, পুনা দেরাদুন, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

1975 খ্রীস্টাব্দের 19শে এপ্রিল ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ বিশেষ দিনটিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নির্মিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরপর ভাস্কর নামক কৃত্রিম উপগ্রহটিকে রাশিয়া থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হয়। 1980 সালের 8ই জুলাই ভারতেরই শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে বিজ্ঞানীরা ভারতের তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 'রোহিণীকে মহাকাশের কক্ষপথে প্রেরণ করেন। এই উপগ্রহটি প্রত্যাশিত 100 দিন মেয়াদের পরও এক বছরের বেশি সময় ধরে চালু ছিল। সুতরাং রোহিণী-1 ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার সমুন্নত বিজয় বৈজয়ন্তী। এরপর ভারত রোহিণী-2, ভাস্কর -2, রোহিণী-ডি 2, রোহিণী ডি-3, ইনস্যাট-1-এ, ইনস্যাট-1-বি, অ্যাপল প্রভৃতি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করেছে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার প্রেরিত সয়ুজ টি-11 মহাকাশযানে রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় নভশ্চর হিসাবে যোগ দেন।

একথা অনস্বীকার্য যে মহাকাশ গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এই প্রকল্প গ্রহণ উচিত কিনা তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অর্থব্যয় বৃথা অপচয় নয়। নানাবিধ কাজে উপগ্রহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার কাজে উপগ্রহের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। সুতরাং জাতীয় স্বার্থেই ভারতকে মহাকাশ গবেষণায় উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করতে হবে।

প্রযত্নে অমলেন্দু সরকার
সুভাষপল্লী, পোঃ খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর।

[চার]

গত দু'দিনে জাহাজের হালচালের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছি। গঙ্গার মোহনা ছাড়িয়ে আমাদের জাহাজ এখন নীল দরিয়ার বুকে। যতদূর চোখ যায়, শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। নীলের আভা লাগানো ঘন কালো জল, তাই বোধ হয় এর নাম কালাপানি। সাদা ঢেউ কালো জলের মাথায় উপছে পড়ছে। মাঝেমাঝেই চোখে পড়ে উড়ুক্কু মাছের দল জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আবার জলের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গতকালও আকাশে চোখে পড়েছে সাদা গাংচিলের সারি। ডাঙা দূরে সরে যাওয়ার পর আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। আকাশের মুখ থমথমে, কালো মেঘের রাশি জমছে চারিদিকে।

জাহাজের রেডিয়ো অফিসার মিঃ দত্ত মুখ গম্ভীর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উনি বললেন, হয়তো সাইক্লোন হতে পারে। ওর কথা শুনে যাত্রীদের অনেকেই বেশ ঘাবড়ে গেছে। তবে আমার খুব একটা চিন্তা নেই। আমার কেবলই মনে পড়ছিল, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র কথা। 'সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের' অভিজ্ঞতা এবার তাহলে আমারও হবে। গত দু'দিন শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে আর গল্প করে বেশ একঘেয়ে লাগছে।

কেবিনের পাশে বারান্দায় চেয়ারে একলা বসে বিকেলের সমুদ্র দেখছি! ভাবছি কখন কেমন করে সাইক্লোন সবকিছু সাড়ে বত্রিশ ভাঁজা করে লক্ষ্য করতে হবে। এমন সময় আমার পাশে এসে বসলেন ডঃ শ্রীবাস্তব। ভদ্রলোক ভারত সরকারের খনিজ তেল বিভাগের বৈজ্ঞানিক। শুনেছি, পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছেন।

আন্দামানে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে কিনা উনি তারই সমীক্ষা চালাচ্ছেন ওঁর দলবল নিয়ে গত চার বছর ধরে। ওর দলের লোকেরা অবশ্য আগে থেকেই আন্দামানে রয়েছে। ডঃ শ্রীবাস্তব নিজে এবার মাসখানেকের জন্য যাচ্ছেন, পরে আবার যাবেন। এভাবেই ওদের কাজ চলে। তবে আমি অবশ্য এতসব জানতাম না। এ সবকিছুই কাকার মুখে শোনা।

গতকালই প্রথম ডঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ভদ্রলোক উত্তর প্রদেশের মানুষ। পরিষ্কার বাংলা বলেন ও বোঝেন। ওর বাংলা শুনলে বোঝা যায় না, উনি অবাঙ্গালী।

তাছাড়া বছর চল্লিশের এই ভদ্রলোক খুবই অমায়িক ও ভদ্র।

ডঃ শ্রীবাস্তব আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন, 'কি বাদলবাবু, তোমাকে তখন থেকে ডাকছি, শুনতেই পাচ্ছ না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?'

'কিছু না, এমনি। দেখতে ভালো লাগছে, তাই তাকিয়ে আছি।'

'জানো, চার বছর আগে যখন আন্দামানে প্রথম যাচ্ছিলাম, তখন তোমার মতো আমিও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সারাদিন বসে থাকতাম। দারুণ লাগত। কিন্তু এখন বড্ড একঘেয়ে লাগে।'

'আচ্ছা শ্রীবাস্তব চাচা, আপনি তো পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছেন, কিছু গল্প বলুন না।'

'না, না, পৃথিবীর সবকিছু দেখবার তেমন সুযোগ আর পেলাম কোথায়? তবে আন্দামানের দ্বীপগুলো মোটামুটি চষে ফেলেছি। যদি শুনতে চাও, আন্দামান সম্পর্কে কিছু বলতে পারি।'

উৎসুক গলায় বলি, 'বেশ তো, তাই বলুন না। আমি তো আন্দামান সম্পর্কেই শুনতে চাই—'

শ্রীবাস্তবচাচা বলতে শুরু করেন, 'বুঝলে বাদল, আন্দামান কিন্তু একটা দ্বীপ নয়। আসলে প্রায় শ'দুয়েক দ্বীপ নিয়ে তৈরি, যদিও বড় দ্বীপের সংখ্যা মাত্র বারো কি তেরো। আন্দামান সম্পর্কে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জান? যদি তুমি সমুদ্রকে দু'শো মিটার নিচে নামিয়ে দাও, তো দেখতে পাবে বার্মা, আন্দামান, ইন্দোনেশিয়া—সব ক'টা জায়গাই কেমন এক সঙ্গে জুড়ে গেছে। আর তাই

ভূতাত্ত্বিকরা ভাবছেন, বার্মা কিংবা ইন্দোনেশিয়াতে যা পাওয়া যায়, আন্দামানেও নিশ্চয়ই তা' পাওয়া যাবে। আসাম, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়াতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে, তাহলে আন্দামানেই বা তেল পাওয়া যাবে না কেন! তাই আন্দামানে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আর যার মনেই সন্দেহ থাক, আমার মনে নেই। ধর—'

হঠাৎ কোথা থেকে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো হাজির হলেন মিঃ তলাপাত্র, 'আরে এই যে ডঃ শ্রীবাস্তব, আপনাকে তখন থেকে খুঁজে মরছি, আর আপনি এখানে—'

এমন সময় আমার দিকে নজর পড়ল মিঃ তলাপাত্রের, 'আরে তুমিও দেখছি এখানে। এদিকে তোমার কাকা তো সেই কখন থেকে তোমাকে খুঁজছেন। ওপরের ডেকে চলে যাও, দেখতে পাবে।'

এখান থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না, তাছাড়া শ্রীবাস্তবচাচার সঙ্গে গল্পটাও বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু মিঃ তলাপাত্রের জন্যই আমাদের জমাট আড্ডাটা ভেঙ্গে গেল। মনে মনে বেশ রাগও হলো। কিন্তু কী আর করব! আস্তে আস্তে ওপরের সিঁড়ির দিকে এগোলাম। সিঁড়িতে উঠে পেছন ফিরতেই নজরে পড়ল, মিঃ তলাপাত্র ফিসফিস করে কী যেন বলছেন ডঃ শ্রীবাস্তবকে। মিঃ তলাপাত্রের কথা বলবার ভঙ্গীটা যেন কীরকম। মনে খটকা লাগল, গোপন কথাবার্তা বলবার জন্যই কি এভাবে সরিয়ে দিলেন আমাকে!

ওপরের ডেকে দেখি, কাকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কি রে বাদল? খাবি?'

ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমাকে খুঁজছিলে নাকি?'

'না তো। কে বলল?'

'মিঃ তলাপাত্র—'

'আশ্চর্য! আর তাছাড়া আজ সকালে মাত্র একবারই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর তো আর দেখাই হয় নি।'

'বুঝলে কাকা, তুমি প্রথমদিন ঠিকই বলেছিলে, লোকটা যেন কী রকম! আমি চলে আসবার সময় দেখলাম, শ্রীবাস্তব চাচার সঙ্গে মিঃ তলাপাত্র খুব নিচু গলায় ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করছেন।'

বেয়ারা আমার হাতে অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল দিতেই স্ট্রতে টান দিলাম। বাঃ, কি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। ডিসেম্বর মাস হলেও জাহাজে কিন্তু শীতটা একদমই মালুম হচ্ছে না।

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জান কাকা, শ্রীবাস্তবচাচা আজ বলছিলেন, আন্দামানে নাকি পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেতে পারে। তুমিও তো একথাই বলেছিলে আমাকে। আচ্ছা কোন দ্বীপে পাওয়া যাবে, তা' কি তুমি জান?'

সৃজনকাকা হেসে বললেন, 'ঝট করে বলা মুশকিল। তার আগে আরো কিছু খবর চাই।'

'কী খবর?'

'সেগুলো জানতেই তো আন্দামান যাচ্ছি। তা না' হলে তো আর আন্দামান যাওয়ারই দরকার হতো না।'

কাকার কথাগুলি কেমন যেন হেঁয়ালি, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই হতাশ চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম কাকার দিকে।

একটু পরে কাকা আবার বললেন, 'চল, নিজেদের ঘরেই যাওয়া যাক। আমাদের ঘরের দু'জন দেখছি ওপরেই বসে আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলা যাবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। ডেক বারান্দায় ডঃ শ্রীবাস্তবদের আর দেখতে পেলাম না। কোথায় গেছে কে জানে। আমাদের কেবিনের কাছে আসতেই দেখলাম, মঙ্গোলীয় চেহারার একটা লোক আমাদের কেবিনের দিক থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। লোকটার হাঁটার ভঙ্গীটা কেমন যেন সন্দেহজনক। এই লোকটা আবার কে! একে তো আগে কখনো দেখিনি।

কাকা কেবিন ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি জালের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, যাতে ঝট করে বাইরের কেউ ঢুকে না পড়তে পারে। সব জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন কাকা। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা।

এরপর কয়েকটা যন্ত্রপাতি ও ম্যাপ দেখিয়ে কাকা অনেক কিছু বললেন আমাকে। আমিও খুব মন দিয়ে সেসব শুনলাম। কাকা যা বললেন, তার সারমর্ম মোটামুটি এই রকম:

ডঃ শ্রীবাস্তবের মতো কাকারও বদ্ধমূল ধারণা, আন্দামানে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবেই। এ রকম ধারণা কোন অলস মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, এর পেছনে রয়েছে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি। তাছাড়া কাকা অনেক চেষ্টায় জোগাড় করেছেন আন্দামানের 'এরিয়াল ফটোগ্রাফ', যা আসলে এরোপ্লেন থেকে তোলা ভূপ্রকৃতির ছবি। শুধু তাই নয়, এরপর ল্যাবরেটরিতে 'ফটোগ্র্যামাট্রি' পদ্ধতিতে আন্দামানের একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রও কাকা তৈরি করেছেন। 'ফটোগ্র্যামাট্রি' ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢুকল না, তবে বুঝলাম, এভাবে নাকি 'এরিয়াল ফটোগ্রাফ' থেকে যে কোন জায়গার প্রায় সঠিক মানচিত্র তৈরি করা যায়। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক মানচিত্র দেখলে যেমন আমরা বুঝতে পারি, কোথায় নদী, কোথায় শহর অথবা গ্রামের অবস্থান, তেমনি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র পরীক্ষা করলে মালুম

হয়, কোথায় কোন খনিজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আন্দামানের মানচিত্র থেকে কাকা বুঝতে পেরেছেন, আন্দামানের কয়েকটি দ্বীপে পেট্রোলিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে শুধু সম্ভাবনা আছে বললেই তো হবে না, মাটির তলা থেকে পেট্রোলিয়াম বের করে দেখাতে হবে যে সত্যি সত্যি ওখানে পেট্রোলিয়াম আছে।

আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে তেলের রপ্তানি কমে যাওয়ায় এখন পৃথিবীময় তেলের সংকট। বৃটেন, ফ্রান্স থেকে শুরু করে খোদ আমেরিকায় পর্যন্ত তেলের অভাব। আর ভারতে তো কথাই নেই। তাই এখন সব দেশেই চেষ্টা চলছে কী করে তেলের আমদানি বাড়ানো যায়। ফলে এখন পৃথিবীময় তেল নিয়ে কালোবাজারী চলছে। বেবি ফুড, সিমেন্ট, লোহা-লক্কড়ের মতো তেল নিয়েও পৃথিবীজোড়া কালোবাজারী চলছে। আর এদের ঘাঁটি হলো হংকং, সিঙ্গাপুর। আন্তর্জাতিক চোরা কারবার চলছে পেট্রোলিয়াম নিয়ে। কাকার হাতে এমন কতগুলি নথিপত্র এসেছে যাতে মনে হয় হংকং সিঙ্গাপুরের চোরাকারবারীদের একটা দল আন্দামানের পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে খোঁজখবর পেয়ে গেছে। আর গোপনে এখান থেকে পেট্রোলিয়াম পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে এতসব জানতে পারল ওরা?'

'হয়তো বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে। অথবা এমনও হতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে জাপানীরা ছিল, তারাই হয়তো আন্দামানের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তেলের খোঁজ পেয়ে যায়। বলা যায় না, চোরাকারবারীদের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে, যে জাপানীদের কাছ থেকে খোঁজখবর পেয়ে থাকবে। নেহাৎ জাপানীরা যুদ্ধে হেরে গেল, না হলে কী যে হতো বলা মুশকিল!'

কাকার কথা শুনে আমার মুখ ফ্যাকাশে। বললাম, 'কিন্তু কাকা, এতো দেখছি বিরাট ব্যাপার। আমরা দুজনে মিলে এত বড় ব্যাপার কি সামলাতে পারব? আমাদের বন্দুক নেই, অস্ত্র নেই—'

মৃদু হেসে কাকা নিজের স্যুটকেশ থেকে কী একটা জিনিস যেন বের করলেন। তাকিয়ে দেখি, চকচকে কালো রিভলভার। আমার দিকে তাক করে রয়েছেন কাকা!

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, 'এটা আবার কখন নিয়ে এলে? আগে দেখি নি তো!' কাকা হেসে বললেন, 'এটা তেমন কিছু নয়। একটা বদমাশের জন্য একটা গুলিই যথেষ্ট।'

'জান কাকা, আমিও সঙ্গে করে বেশ কিছু দোদমা আর চকলেট বোমা নিয়ে এসেছি।'

এমন সময় জানলায় যেন কার ছায়া। মিঃ তলাপাত্র নাকি!

একটু পরেই জাহাজে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল।

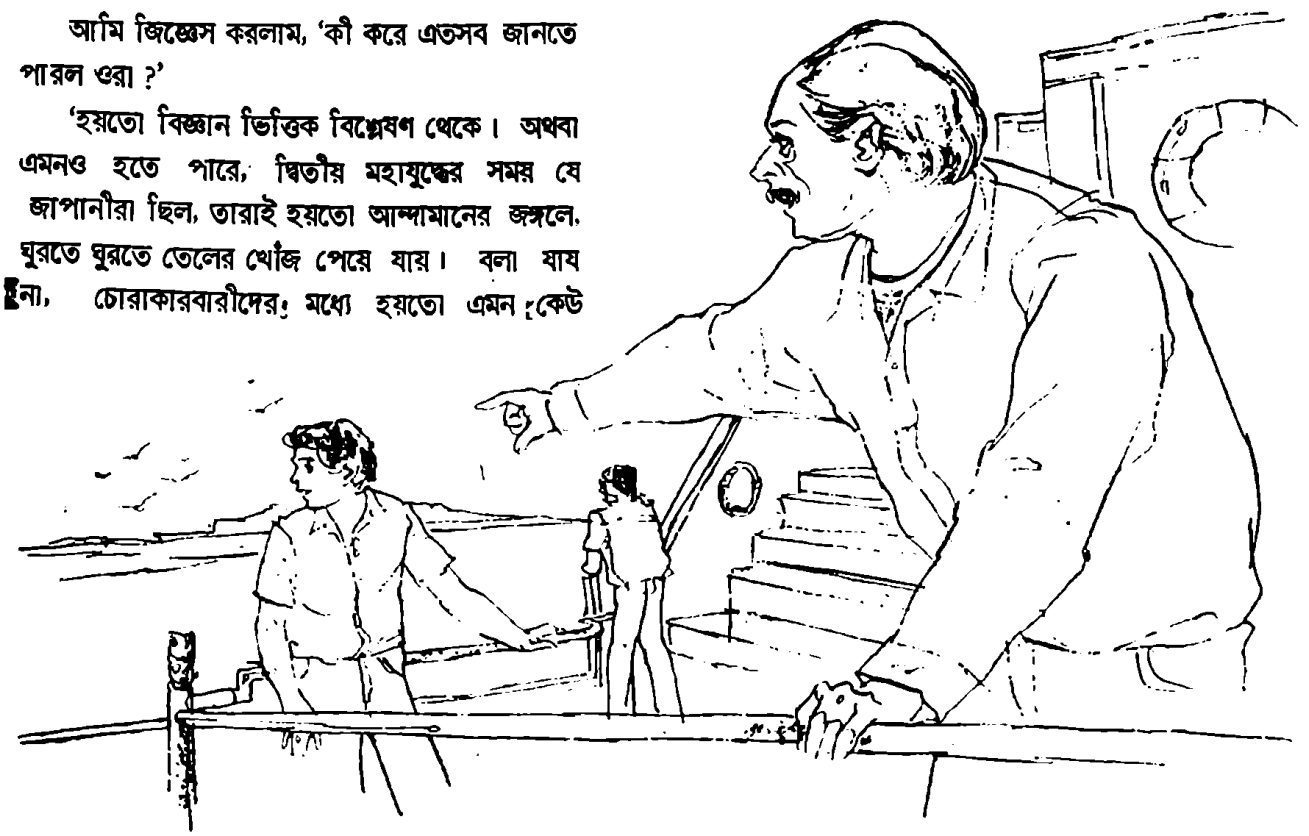

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম / অষ্টম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

কুসংস্কার

মৌসুমী দত্ত

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করতে গেলে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়ম বা অনুশাসনের কতক ভাল বা মন্দ আছে। আমাদের ভারতবর্ষ আয়তনে যেমন বিশাল লোকসংখ্যাও তেমনি বিপুল। এই বিপুল লোকসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। গ্রামবহুল ভারতবর্ষে শিক্ষার আলো এখনও গ্রামে এসে পৌছায়নি। ফলে অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাদের বেশির ভাগই কুসংস্কারের শিকার। বংশ পরম্পরায় যে বিশ্বাসের শিকড় তাদের মনের মধ্যে গেড়ে বসে আছে তা থেকে তাদের মুক্ত করা মুশকিল। এই সমস্ত কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। যাত্রাকালে হাঁচি, মনে মনে কোন কিছু ভাববার সময় টিকটিকির ডেকে ওঠা, তিথি, নক্ষত্র, দিন, পাঁজি দেখে যাত্রা করা এক-একটি কুসংস্কার। যে দেবতাকে মানুষ কোনদিন দেখেনি, সেই দেবতার তুষ্টি-সাধন ও কৃপালাভের জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে দেবতার মন্দিরে গিয়ে বলি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে হয়। কিন্তু এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মানুষ ভাবে কোন দেবতার কারসাজি। তখন সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ নানারকমের হোম-যাগ-যজ্ঞ করে। কারও অসুখ হলে আমরা ডাক্তার দেখাই। কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক তা না করে দেবতার কাছে মানত করে। কুসংস্কারের বশেই মানুষ এটা করে। গ্রহণের বেলায়ও ঠিক তাই। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধেও কুসংস্কার লোকের মনে দানা বেঁধে আছে। পুরানের কথা অনুযায়ী রাহু ও কেতু নামে দুই অসুর চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করার ফলে গ্রহণ হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাই ঢাক, ঢোল বাজিয়ে ওই দুই অসুরকে পূজা করে যাতে তারা তুষ্ট হয়ে চন্দ্র ও সূর্যকে ছেড়ে দেয়। অনেকে আবার নদীতে স্নান করে পুণ্যার্জন করেন। অশিক্ষিত লোকেরাই যে কুসংস্কার মেনে চলেন তা নয়। স্কুল, কলেজে পড়া শিক্ষিত লোকেরাও এই সব প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন। শুধু আমাদের দেশে নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ আছেন। দেশ থেকে এই সব কুসংস্কার দূর করতে গেলে প্রকৃত শিক্ষার দরকার। যাতে তারা বুঝতে পারে যে এগুলি কোন দেবতার কারসাজি নয়। প্রতিটির পেছনে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ। প্রতিটি মানুষকে জানতে হবে কুসংস্কারগুলির মূল কারণ। তবেই দেশ থেকে কুসংস্কার দূর হবে।

দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

[37 পৃষ্ঠার পর]

আমরা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে এলাম।

বাইরে মাইকে এতক্ষণ হিন্দি গানের সুর বাজছিল। সেই গান থেমে জাহাজের ঘোষকের ঋজু গলার স্বর ভেসে উঠল—'যাত্রীরা সাবধান হোন। সাইক্লোন আসতে পারে। ঘরের ভারী মালপত্রগুলো বেঁধে রাখুন। আপনার লাইফ জ্যাকেটটি পরীক্ষা করে নিতে ভুলবেন না।'

এই ঘোষণা শেষ হবার পর মাইকে করুণ রসের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজতে লাগল। গানটা বোধ হয় এই রকম, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু—

গানের সুর শুনে কেমন যেন মনে হলো, জাহাজ হয়তো ডুববে না, কিন্তু তেলের চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুঝতে এসে প্রাণে মারা পড়ব না তো!

কিন্তু লাউডস্পিকারে ঘোষণার পর শুরু হলো জাহাজময় ছোটাছুটি। আতংকিত যাত্রীরা ওয়েলফেয়ার ও রেডিয়ো অফিসারের কাছ থেকে সাইক্লোনের গতিপ্রকৃতি জানতে ব্যস্ত। কেউ কেউ লাইফ-জ্যাকেট পরে মহড়া দিতে শুরু করল। দু'চারজন আবার ওপরের ডেকে উঠে জাহাজ থেকে নৌকো নামাবার কায়দা কানুন শেখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাহাজে হাঁটতে হাঁটতেই বুঝতে পারলাম, জাহাজের দুলুনি খুবই বেড়ে গেছে, রোলিং ও পিচিং দুইই হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই বমি করছে, ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ ধরাশায়ী। কিন্তু আমার বমিটমি আসছে না, বরং জাহাজের দুলুনিতে বেশ মজাই পাচ্ছি যেন। রাতের খাওয়ার ঘণ্টা বাজল। তাই খাওয়া-দাওয়া কোন রকমে সেরে সবাই একেবারে বিছানায়।

তবে শরৎচন্দ্রের সেই লেখার মতো তেমন কিছুই হলো না। একটু হতাশ হলাম। অবশ্য পরে জেনেছিলাম, জাহাজের খোলে সেদিন যারা ছিল, তারা কেউই সারারাত ঘুমতে পারে নি।

কিন্তু ওপরে ডানলোপিলোর নরম বিছানায় জাহাজের দুলুনিতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানতেই পারি নি।

[চলবে]

ডায়নোসর

ঋণা রাজন

ভস্মীভূত না হলে, মৃত প্রাণিদেহের নরম মাংসল অংশগুলি গলনে পচনে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অন্য প্রাণী দ্বারা ভক্ষিত হতে পারে। অথবা, মৃত জীবজন্তু বা শুকনো গাছপালা ভূমি অবক্ষয়জাত পলিজের সঙ্গে জলধৌত হয়ে আশ্রয় নিতে পারে, জলাশয় অথবা সমুদ্রের তলদেশে। তবু অনেক সময়েই কঠিন অস্থি কাঠামোটি অক্ষত অবস্থায় চাপা পড়ে যায়। প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাসে ঐ সমস্ত জীবাবশেষ, মাটি, পাথর, গাছ, বালি ইত্যাদির চাপে ক্রমে ক্রমে স্তরীভূত হতে থাকে। উপর্যুপরি পলিজাবশেষের চাপ, জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, কোনও ক্রমেই বাতাসের সংস্পর্শে না এলে, এগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে না ও পরিশেষে প্রস্তরীভূত হয়। অস্থি কাঠামোটির মূল উপাদান সবই অন্যান্য খনিজ পদার্থ দ্বারা আংশিক অথবা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হয়ে, থেকে যায় মূল কাঠামোটির প্রস্তরীভূত এক অবিকল প্রতিরূপ। অস্থির প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ামের স্থানটি মূলতঃ দখল করে নেয় সিলিকা। এই প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহাবশেষই fossil বা জীবাশ্ম। এই জীবাশ্মই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে মানবসভ্যতার একমাত্র যোগসূত্র। কখনও কোনও প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ অস্থি কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়, আবার কখনও কখনও খণ্ড খণ্ড জীবাশ্ম সংযোজন পূর্বক পূর্ণাবয়ব কাঠামোটি গঠন করেন পুরা জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ। এরপর কুশলী ভাস্কর প্রাণীটির মডেল তৈরি করেন। এই ভাবেই ডায়নোসরদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মেছে। কারণ, ডায়নোসরদের কালে ফোটো তুলে রাখতে কোনও মানুষের জন্ম হয় নি। মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির কনিষ্ঠ সন্তান। বয়স মাত্র বিশলক্ষ বছর। আর পুরাজীবতাত্ত্বিক কালক্রম অনুযায়ী, 2300 লক্ষ বছর পূর্ব থেকে 650 লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত হল 'মেসাজনিক এরা'। এই কালেই ডায়নোসরদের উদ্ভব, বংশবৃদ্ধি ও অবলুপ্তি। সেই যুগে, সম্ভবতঃ পুরো স্থলখণ্ডই ছিল অবিচ্ছিন্ন, যাকে বলা হ'ত গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড, অর্থাৎ ডায়নোসরদের বিচরণ ক্ষেত্রও ছিল অবাধ। 'ডায়নোসর' কথাটির অর্থ ভয়ঙ্কর টিক্‌টিকি।

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উন্মেষ এককোষী প্রাণীতে তিনশত কোটি বছর পূর্বে। এককোষী থেকে বহুকোষী। মাছ হল প্রথম মেরুদণ্ড প্রাণী। এর পর এসেছে উভচর ও সরীসৃপ। সরীসৃপকুলের বিবর্তনেতিহাসের চরম দৃষ্টান্ত হ'ল ডায়নোসর। ভূচর জীবের মধ্যে বিশালতায় এর জুড়ি মেলে নি। তবে সকলেই বিশালকায় ছিল এমন নয়, ক্ষুদ্রদেহীও ছিল অনেকে। প্রধানতঃ দুটি প্রজাতির মধ্যে, সৌরপড্‌স হল উদ্ভিদ ভোজী ও থেরোপড্‌স মাংসভোজী। প্রচুর বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রজাতিতেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল, যেমন অতিক্ষুদ্র মস্তক ও সুদীর্ঘ গ্রীবা। মাংসভোজীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে লম্বা গলার উদ্ভিদ্‌ভোজীরা জলের গভীরে লুকোত।

দৈত্যাকৃতি নিরামিষাশীদের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল

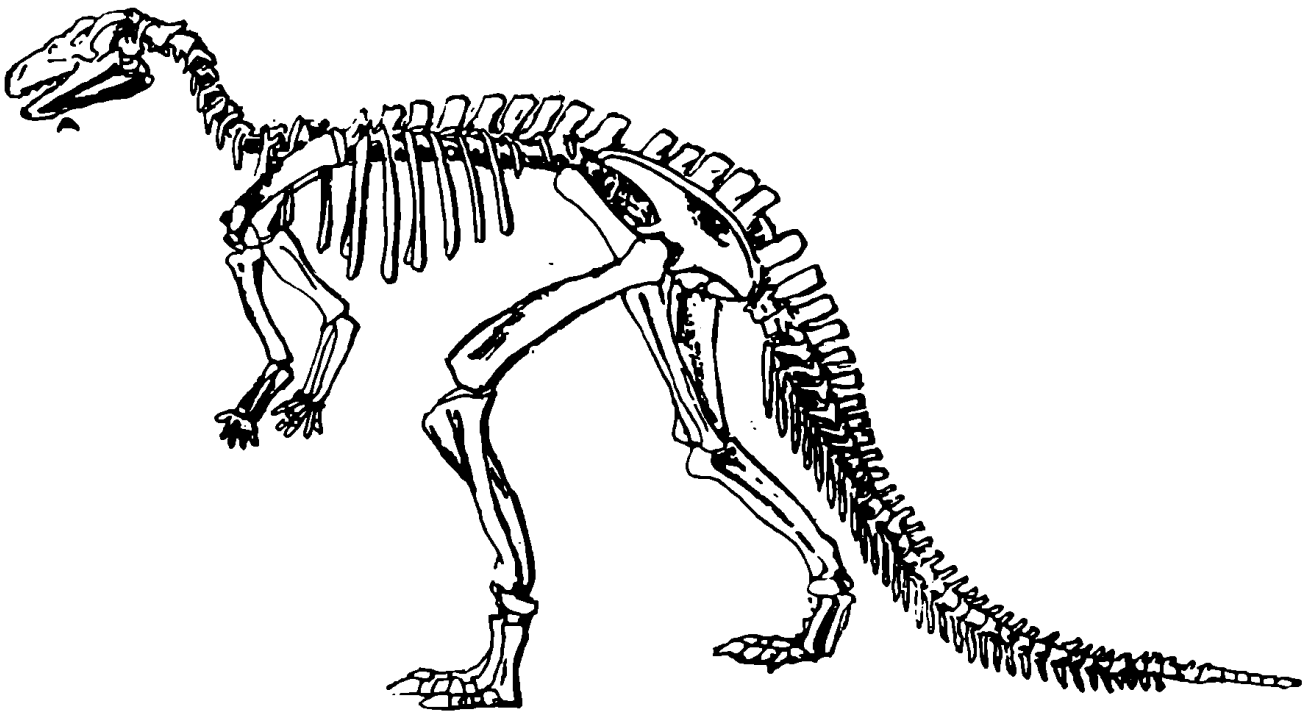

ডিপ্লোডকাস (Diplodocus), ব্রাকিও সরাস (Brachio Saurus) ব্রণ্টোসরাস, ইগুয়ানোডন (Iguanodon), কাম্পটোসরাস ইত্যাদি। এদের মধ্যে দীর্ঘমত হ'ল ডিপ্লোডকাস, প্রায় পঁচিশ মিটার লম্বা লেজ যা পুরো শরীরের অর্ধেক। ব্র্যাকিওসরাস ছিল সবচেয়ে ওজনদার, সত্তর থেকে আশি টন। ব্রয়োসরাসও বিশালদেহী, প্রায় পঁচিশ মিটার লম্বা। ওজন তিনশ টনের কাছাকাছি। ইগুয়ানোডনের আকৃতি ছিল অধুনা ইগুয়ানা বা গোসাপের অনুরূপ। এদের দ্বিপদ বলা চলতে পারে। কারণ দু'পায়ে ভর দিয়ে এরা দিব্যি হাঁটতে পারত। স্টেগোসরাসের পৃষ্ঠদেশ ছিল ত্রিভুজাকৃতি অস্থি-সম্বলিত ধনুকের মতন বর্মাবৃত। দানবদেহী মাংসাশীদের মধ্যে, যুদ্ধবাজ বলশালী হিংস্র হ'ল মেগালোসরাস, এ্যাল্লোসরাস (Allosaurus), টেরোসরাস, টাইরান্নোসরাস (Tyranno saurus)। পনেরো মিটার দীর্ঘ টাইরান্নোসরাস' পাঁচমিটার লম্বা লেজ সমেত খাড়া দাঁড়াতে পারত। পনেরো সেঃ মিঃ লম্বা লম্বা ধারালো দাঁত ছিল এদের। এর মডেল রয়েছে, হায়দ্রাবাদের নেহরু জুলজিক্যাল পার্কে। এ্যাল্লোসরাসের দৈর্ঘ্য ছিল দশ থেকে বারো মিটার উচ্চতা চার মিঃ এর প্রমাণ সাইজের মডেল স্থাপিত হয়েছে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারাল হিস্ট্রীতে। আর স্টেগোসরাসের মডেল দেখতে পাবে, বাঙ্গালোরে কাব্বন পার্কে। 1800 লক্ষ বছর পূর্বেকার উদ্ভিদ্‌ভোজী বিপুলকায় ডায়নোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলায় এবং মহারাষ্ট্রের চণ্ডপুরা জেলায়। মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরে মাংসাশী নিরামিষাশী দুই প্রজাতির জীবাশ্মই মিলেছে। গুজরাটে অস্থি কাঠামো ছাড়াও ডিমের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। প্রথম জীবাশ্মটি আবিষ্কৃত হয় 1822 খ্রীঃ ইংলণ্ডে। সেটি ছিল ইগুয়ানোডনের কাঁটাওয়ালা বুড়ো আঙুলের জীবাশ্ম।

জৈবিক বিবর্তনে, ডায়নোসরের আকার যেমন বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়েছিল, তেমনি সংখ্যাতেও বৃদ্ধি হয়েছিল বহুগুণ। কিন্তু, কি কারণে সকলেই চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা আজও রহস্যাবৃত। মনে হয়, কোনও নির্দিষ্ট কারণে নয়, নানান্ প্রতিকূলতা একই সঙ্গে কাজ করেছে। অকস্মাৎ জলবায়ুর পরিবর্তন, ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রবল উল্কাবর্ষণ অথবা বহিরাগত গ্রহাণুখণ্ডের প্রত্যাঘাত, মহাজাগতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা মত পোষণ করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এখনও কোনও মতই বিশ্বগ্রাহ্য হয় নি। তবে, দেড়শত কোটি বছর যাবৎ ডায়নোসররা রাজত্ব করে গেছে সারা ভূখণ্ডেই। অকস্মাৎ নির্মূল না হ'লে হয়তো অন্য কোনও বুদ্ধিমান জাতি পৃথিবীতে আধিপত্য করতো। শুধু তাদের গড়ন হত সরীসৃপ সদৃশ!

প্রযত্নে অরিন্দম গাঙ্গুলী
30/1, ল্যান্সডাউন রোড, প্লট-05, কল্-20

ছোটবেলায় যেদিন প্রথম শুনলাম কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে চলে যায়, কাক তা বুঝতেও পারে না, নিজের ডিম মনে করে তা দিয়ে চলে, সেদিন কাককে তার সহস্র ধূর্তামি সত্ত্বেও বেজায় গবেট প্রাণী বলে মনে হয়েছিল। পরে, যেদিন প্রমাণ পেলাম, কোকিলের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়ে কাকের পরিশ্রম করে সংগ্রহ করা খাবার তো আত্মসাৎ করেই উপরন্তু, কাকের আসল বাচ্চাটাকে, কাক যখন বাসায় নেই, তখন পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাসার বাইরে ফেলে দেয় জন্মের মত, সেদিন আবার কোকিলের গলায় যত মিষ্টি সুরই থাকুক তাকে আস্ত শয়তান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। তখন কাকের জন্যই করুণা হত। কিন্তু ক'দিন আগে গ্যালাপাগোস দ্বীপের একটা সামুদ্রিক পাখির জীবনকথা জানবার পরে মনে হল, এই ধরনের নিষ্ঠুরতা মানুষের চোখে ভীষণ নিন্দার ঘটনা প্রকৃতিতে অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই হরদম ঘটছে ; তবে, সেই সব প্রাণীদের কাছে সেটাই স্বাভাবিক। তারা কেবল বংশপরম্পরায় এক একটা অদ্ভুত অভ্যাস পালন করে আসছে। আবার, এই অদ্ভুত অভ্যাস আমাদের কাছেই অদ্ভুত, তাদের কাছে নয়। কারণ, এই অভ্যাসের জোরেই তারা এতদিন ধরে সফল ভাবে বংশ রক্ষা করতে পারছে।

ইংরাজীতে পাখিটিকে বলে বুবি (Booby)। এরা এবং গ্যানেটরা মিলে তৈরি করেছে একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী—সুলিডী (Sulidae)। গ্যালাপাগোস দ্বীপে তিন ধরনের বুবি দেখা যায়, লাল-পা বুবি, নীল-পা বুবি আর সাদা বা মুখোশপরা বুবি। লাল-পা তার বাসা বানায় সাধারণ প্রথা অনুযায়ী, কোনো ঝোপঝাড়ে বা গাছের ডালে। বাকি দুটো সেরকম কোনো বাসা বানায় না, পাথরের উপরেই গুয়ানো (পাখির বিষ্ঠা) দিয়ে গোল বৃত্ত তৈরি করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। এদের নিয়ম হল, 'বাসার বাইরে যাই থাক, নজর দেবে না। বাসার মধ্যে নজর দাও।' তার মানে, ওই সাদা সাদা গুয়ানো দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুই তার সমস্ত পরিচর্যার কেন্দ্রবিন্দু। বাইরে কি ঘটছে তাতে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। হরদমই পর্যটকরা বা বিজ্ঞানীরা তাদের বাসায় প্রায় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন ফটাস ফটাস করে, তাতে তাদের বিন্দুমাত্রও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। এরা কতদূর পর্যন্ত ভ্রূক্ষেপ না করে থাকতে পারে, তা দেখার জন্য একজন বিজ্ঞানী তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলটা সন্তর্পণে গুয়ানোর দাগের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন পাখিটার দিকে। প্রথমে পাখিটার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, নট নড়ন চড়ন। কিন্তু তাঁর পা যেই ঐ দাগ ছাড়িয়ে মোটামুটি মাঝ দূরত্ব পর্যন্ত গিয়েছে, অমনি পাখিটার প্রতিবাদ শুরু হল। বোঝা গেল, ওইটুকু দূরত্বের বেশি কাউকে সে অগ্রসর হতে দেবে না। গুয়ানোর দাগ ছাড়িয়ে কিছুটা ভিতরে একটা অদৃশ্য বৃত্ত হল তার নজরবন্দী অঞ্চল। সেখানে সে বসে থাকে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। কোনো দিকে না তাকিয়ে ডিমে তা দিতে থাকে।

নীল-পা বুবি তিন-চারটে ডিম পাড়ে এক সঙ্গে। ডিম পাড়লেই শুধু চলে না। বাচ্চা সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে খাবার এনে এনে খাইয়ে বাঁচিয়েও রাখতে হয়। কিছু কিছু

প্রজাতির বুবি, যাদের অনেক দূরে, প্রায় 300 মাইল দূর এলাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, তারা মাত্র একটাই বড় ডিম পাড়ে। ঐ ডিম থেকে জন্ম নেয় বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছানা! সে তার বাবা-মা'র খাবার আনতে যাওয়া-আসার লম্বা সময়টুকু অন্তত না খেয়ে বেচে থাকতে পারে। আবার, পেরুতে পাওয়া যায় এক ধরনের বুবি, তারা কাছাকাছি সমুদ্রের খাঁড়ি থেকে এত মাছ পায়, যে হেসেখেলে তিন-চারটে ছানাকে 'মানুষ' করতে কোনো কষ্টই হয় না। কিন্তু, নীল পা বুবির ব্যাপারটা অমন সহজ-সরল না। নীল পা বুবি তিন চারটে ডিম পাড়লেও সব বছরে সমানভাবে খাবার জোটাতে পারে না। যে বছর খাবার-যথেষ্ট, সে বছর সবকটা ছানাই বেঁচে গেল। কিন্তু, যে বছর খাবার কম, সে বছর মাত্র একটা বাচ্চাই বাঁচে। খাবারের অভাবে না খেতে পেয়ে মরতে মরতে মাত্র একটা বাচ্চা বেঁচে থাকে—ব্যাপারটা এমন নয়, এর পিছনে একটা অদ্ভুত ঘটনা কাজ করে।

মা-বুবি বেশ কয়েকদিন বাদে বাদে ডিমগুলো পাড়ে। ফলে ডিম ফুটে যে বাচ্চাগুলো বেরোয়, তাদের মধ্যেও বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকে। খাবার যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তখন নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার একসঙ্গে বেড়ে ওঠে। কিন্তু, যে বছর খাবার কম, সেই বছর ধাড়ি ছানা ফাঁক পেলেই তার সহোদর ছোট ভাই বা বোনদের ঠেলে গুয়ানোর চৌহদ্দির বাইরে বার করে দেয় এবং একমাত্র সেই একা বেঁচে থাকে। প্রথমে মনে হতে পারে ঠেলে দিলেই বা কি, ছানাটা কি আবার ফিরে আসতে পারে না, অথবা, চিৎকার লাফালাফি করে মা-র বা বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না? মা-তো তার সন্তানকে চিনবে! কিন্তু না, বাসার বাইরে যে-ই থাক, তাতে নীল-পা বুবিদের কোনো নজর পড়ে না, তারা বাসার মধ্যে যাকে পায় তাকেই কেবল পালন করে চলে। আর, কখনো যদি বেচারা শাবকটি নিজের চেষ্টায় বাসায় ফিরতে চায়, তখন, ঐ বিজ্ঞানীটির বুড়ো আঙুল নির্দিষ্ট গন্ডি পেরোনোর পর যে রকম সমাদর পেয়েছিল, তার কপালেও সেরকমই জোটে। মা-বুবি তাকে চিনতেই পারে না, মনে করে বাইরের কোনো জীব। অর্থাৎ একবার বার করে দিতে পারলে ধাড়ী-ছানাটার খাবারের ভাগীদার কেউ হবে না।

পর্যটকরা দেখেন মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে নিজেরই শাবক ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে, মা-বুবি যেন তা দেখেও দেখছে না। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়। জোর করে ঐ বাচ্চা-টাকে বাসার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। আর তা উচিতও নয়। কারণ, এই নিষ্ঠুরতা (মানুষের কাছে নিষ্ঠুরতা, পাখির কাছে নয়) বিনা কারণে আসেনি। খাবার যখন কম, তখন তিন-চারটে ছানাকে একসঙ্গে বাঁচাতে গেলে, তারা কেউ তো বাঁচতই না।

তৃতীয় যে প্রজাতিটি গ্যালাপাগোসে আছে, সাদা বা মুখোশ-পরা বুবি, তাদের নিয়ম নীতি আরো কঠোর। এদের খাবার সংগ্রহ করতে হয় যথেষ্ট দূর থেকে, এবং প্রধানত উড়ুক্কু মাছই এদের খাবার। সুতরাং এদের ডিমের সংখ্যাও কম থাকা উচিত। মুখোশ-পরা-রা কখনো হয়ত মাত্র একটা ডিমই পাড়ে। কিন্তু সচরাচর পাড়ে দুটো ডিম। এবং দুটো ডিম ফুটে দুটো ছানা বেরোবার পর প্রত্যেক ক্ষেত্রে, খাবার পর্যাপ্ত থাকুক আর না থাকুক, বড়টা ছোটটাকে ঠেলে বার করে দেয়। এই নিয়মের কোনো এদিক-ওদিক ঘটে না। নীল-পা বুবির বেলায় না হয় তাও বোঝা যায় যে, খাবারের অভাবে অন্তত একটি শাবকের মধ্য দিয়ে হলেও বংশের ধারা বজায় রাখার জন্য প্রকৃতি ওই নিষ্ঠুর পথ নিয়েছে। কিন্তু, মুখোশ-পরাদের বেলায়?

এই ক্ষেত্রে মা-বুবির দূরদৃষ্টি বেশ কিছুটা অংশে কাজ করে। মা-বুবির উদ্দেশ্য মাত্র একটা শাবককেই বড় করে তোলা। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে দুটো ডিম পাড়ে। প্রায়ই, বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে পাথরের উপরে ডিম পাড়ার ফলে দিনের বেলার অত্যন্ত উত্তাপে কিছু ডিম নষ্ট হয়ে যায়, বা শাবক মরে যায়। তখন, দুটো ডিম থাকলে অন্তত একটাকে বাঁচিয়ে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, যখন দুটো ডিম ফুটেই ছানা জন্ম নেয়, তখন ধাড়ি বাচ্চাটা ছোটটাকে বার করে দেয়। দেখা গেছে, যেসব পাখি দুটো করে ডিম পাড়ে তাদের একশ জোড়া ডিমের মধ্যে আটষট্টিটা পাখি শেষ অবধি বেঁচে থাকে। আর যারা মাত্র একটা ডিম পাড়ে, তাদের একশটার মধ্যে মাত্র বত্রিশটা ছানা বাঁচে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, দুটো করে ডিম পাড়াই বেশি সুফলদায়ক।

দেখা যাচ্ছে, যত নিষ্ঠুরই হোক এই ঘটনা, তা পাখিদের বংশ রক্ষার অনুকূলেই কাজ করছে। পাখিদের এতটা বুদ্ধি নেই, তাদের মগজে এতটা মালমশলা নেই যে তারা খাবারের পরিমাণ দেখে, এতসব পরিণতি বিচার করে সহোদর ভাই-বোনকে ঠেলে বার করে দেবে। অথবা মা-পাখি মাত্র একটা পাখিকেই সব সময় খাওয়াবে, বাসার মধ্যে আর যারা আছে তাদের খাওয়াবে না। এই জন্য তারা নিজেদের স্বভাবে এই কড়া নিয়মটা ঢুকিয়ে নিয়েছে। 'বাসার বাইরে যা-ই থাক, নজর দেবে না। বাসার মধ্যে নজর দাও।' এই নিয়ম, অর্থাৎ 'হ্যাঁ অথবা না'-র মত কাজ করতে পাখিদের বিশেষ মগজের প্রয়োজন পড়ে না।

তবে, একটা কথা এ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। শঠতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা অথবা বুদ্ধিমত্তা-এ সব গুণ বা দোষ আমরা যে নানা ছোটখাটো প্রাণীর ক্ষেত্রে বলে থাকি, এ সমস্তই আমাদের নিজেদের মন-গড়া।

জুলে ভার্ণ-এর

দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
রূপায়ণ- গৌতম কর্মকার

খনিতে কাজ করতে করতে ওর একটা অধিকার-বোধ জন্মে গিয়েছিল। তাই নতুন কয়লার সন্ধান ও কাউকে জানতে দিতে চায়নি। ইয়ারো স্যাফটের মই ধ্বংস করে, তোমাদের সুড়ঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করে ও শেষ করে দিতে চেয়েছিল সবাইকে। হতভাগ্য উন্মাদ!
ওই ঘটনার পরই ঠাকুর্দা পাগল হয়ে যান। ওঁর কাজে বাধা দেওয়ার জন্যে একদিন তো সেই কুয়োটার মধ্যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে পালান। শুকনো কুয়ো। হারফাওটা আমাকে খাবার এনে দিত। তাই মরিনি। তারপর হ্যারি আমাকে উদ্ধার করে।
নাটকীয় ঘটনা!
অবশেষে এসে গেল বিয়ের দিন…
দেখো নেল, গির্জার সামনে নিউ অ্যাবারফয়েলের সমস্ত মানুষ আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। একি! ও কীসের গর্জন?
গড়ড়ড়ড়…ঝপ্
সর্বনাশ! গির্জার পাশেই সুড়ঙ্গের ভিতরে কে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বিপুল জলরাশি প্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে লেক ম্যালকমের জলে।
স্যার--স্যার-- ঐ দেখুন-একটা ডিঙিনৌকা। উন্মত্ত জলরাশির ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে আসছে। কী দুঃসাহস! ঐ বোধ-হয় সিলফ্যাক্স।
জলের সঙ্গে মুক্তি পেলো ভয়ংকর ফায়ার-ড্যাম্পের এক গোপন ভাণ্ডার।
হাহাহা… ফায়ার ড্যাম্প… ফায়ার ড্যাম্প…
মর -- মর তোরা সব। নিপাত যাক নিউ অ্যাবারফয়েল।
42

হা হা হা-- মর-মর তোরা সবাই।
বিস্ফোরণ ঘটার আগে ওকে থামাতেই হবে।
-- হিস-- হিসস--
বাতাসে কারবুরেটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ-- নৌকার উপর উন্মাদ সিল ফ্ল্যাক্স--ল্যাম্পের কাচ ভেঙে ফেলে বাতাসে নাড়াচ্ছে।
হা হা হা--
হিস-- হিসসস--
পালাও-- পালাও-- ছুটে পালাও সব--- খনির বাইরে--
কোথায় পালাবি? গোটা খনিটাই আমি উড়িয়ে দেবো।
আসন্ন অমঙ্গল আতঙ্কে পাতাল-নগরী স্তব্ধ--
কেটে গেল মৃত্যুর মতো কতকগুলো মুহূর্ত--
আশ্চর্য-- বিস্ফোরণ তো হোল না! --হ্যাঁ--সুবিশাল গহ্বরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে ফায়ার-ড্যাম্প খুব পাতলা হয়ে গেছে। উঠে গেছে গম্বুজের ছাদে--
নে-নে হারফাঙ-আলোটা নে। উড়ে যা উপরের ছাদে। দারুণ গ্যাস এখন ওই খানেই জমছে।
উঃ-আর কোনও আশা নেই!
নেল এবার চিৎকার করে উঠলো।
হারফাঙ-- লক্ষ্মীটি--নেমে আয়--আমি এখানে। নেমে আয় বলছি।
43

নেমে এলো বিশাল দানব-পক্ষী।
আয়-আয় হারফাঙ !
খবর্দার-- খবর্দার হারফাঙ .ফিরে আয়। ওখানেনয়- উপরের ছাদে-
লক্ষ্মী পাখী--আলোটা ফেলে দে, ফেলে দে আলোটা ! আমার কথা শোন--আমাদের বাঁচা হারফাঙ!
খবর্দার- ফেলবি না! আমার হুকুম !
উঃ-শয়তানী ! আমার শেষ চেষ্টাও তুই সফল হতে দিলি না। তোর সর্বনাশ হোক !
থামুন-থামুন সিল্ ফ্যাক্স!
ঠাকুর্দা যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো! ওঁকে বাঁচাও হ্যারি।
লেকের জল তোলপাড় করেও বুড়ো সর্ফকে আর পাওয়া গেল না। ছ' মাস পর--
হ্যারি, নেল-- আজ থেকে তোমরা স্বামী-স্ত্রী। তোমাদের জীবন সুখের হোক।
তুষার-পেঁচা হারফাঙ এখনো মাঝে মাঝে ধনিতে আসে। আজীবনের সঙ্গী আর প্রভু এই লেকের জলেই হারিয়ে গেছে কোথায়। কান্নার মতো একটা আওয়াজ করতে করতে সে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে সারা লেকটা। বের্নার্ড নেল ওকে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকে। কিন্তু সে আসে না। দ্রুতবেগে ফিরে যায় আপন কোটরে। নিউঅ্যাবারফয়েলের আকাশে আর তাকে কখনো দেখা যায় না।
শেষ

৪

মানুষের শরীরে আপনা থেকে আগুন ধরে যায় কেন? কেন, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর তো পাওয়া যায়নি আজও তবে এ ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে দেশে দেশে। বলা নেই কওয়া নেই, আচম্বিতে একটা আস্ত মানুষ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে দাহ্য পদার্থে ঠাসা মশালের মত। আগুনের সংস্পর্শে না এসেই মানুষ-মশাল হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কেউ নিজের শরীরের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। কারও গায়ে আঁচ লাগেনি—অথচ তার শরীর জ্বলছে মশালের মতই লেলিহান শিখায়! কোন কোন বিচিত্রতম ক্ষেত্রে, শরীর যার জ্বলছে—তার কাছাকাছি বস্তুতে আগুন লাগেনি। চেয়ারে বসা অবস্থায় অথবা বিছানায় শোয়া অবস্থায় হঠাৎ নিজে জ্বলে উঠেছে বটে—কিন্তু আগুনে পোড়েনি চেয়ার বা বিছানা। এমনকি পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া শরীরের পোশাক একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, অথবা সামান্য ঝলসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, শুধু একটা পায়ের পাতা, অথবা একটা মাত্র ঠ্যাং শুধু কয়েকটা আঙুলের ডগা আগুনের লঙ্কাকাণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেছে—বাদবাকি শরীর কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই আপনা হতে মানব-শরীর জ্বলে ওঠার ঘটনা শোনা যায়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ঠাঁই করে নিয়েছে অব্যাখ্যাত এই প্রহেলিকা। চারশ বছরে এ রকম ঘটনার দুশরও বেশি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

সেকালের ঘটনায় যারা পুড়েছে, তারা হয় মদ্যপ ছিল, না হয় মাংসল। এক মোটা বুড়ি ছিল—থাকত একা-একা। আগুন এদের গ্রাস করেছে বন্ধ ঘরে, শীতের অথবা খোলা আগুনের পাশে, বলা বাহুল্য, সাক্ষী ছিল না। ধরে নেওয়া হয়েছিল, ঈশ্বর পাপের শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু সেকালেও ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। এমাসের আলোচনায় সেই সব কাহিনী কিছু কিছু বলা হবে! গবেষণা করে জানা গেছে, পুরুষ এবং মহিলা প্রায় সমান সংখ্যায় পুড়েছে। বয়স তাদের আঁতুড় কাল থেকে 114 বছর পর্যন্ত। এদের মধ্যে অনেকেই মিতাচারী, সংযমী এবং কৃশকায়। কেউ পুড়েছে আগুন যেখানে জ্বলছে তার ধারে কাছে; অন্যান্যরা মশাল হয়ে গেছে গাড়ি চালাতে চালাতে অথবা স্রেফ হাঁটতে হাঁটতে। আগুনের ধারে কাছেও না-থাকা অবস্থায়।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারী অভিমত মানুষের হঠাৎ মশাল হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোকে পাত্তা দেয় না—'অমীমাংসিত' অথবা 'বুদ্ধিলোপকারী' ঘটনা বলে ঠেলে সরিয়ে দেয়। অনেক অনুমিতি উপস্থাপিত করেছে বটে কিন্তু অনুমিতিই মনের ধাঁধা পুরোপুরি কাটাতে পারে না। এমন কোন শরীর বৃত্ত সম্পর্কীয় মডেল হাজির করা যায়নি যা আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে বা নিজে থেকেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মানুষের কলাতন্তু আর হাড়কে এভাবে জ্বলে ছাই হতে গেলে দরকার তিনহাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ-মাত্রা—তাও প্রেসারাইজড় মড়া পোড়ানোর চুল্লিতে। এর পরেও যখন না-পোড়া জামাকাপড় অথবা কিছু প্রত্যঙ্গকে দিব্বি মাংসল রেখে বাদবাকি শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে, তখন অব্যাখ্যাত ব্যাপারগুলো বুদ্ধিভ্রংশকারী ব্যাপার হয়ে ওঠে।

প্রাচীনতম ঘটনা

নথিভুক্ত করা হয়েছে, এমন একটি প্রাচীনতম ঘটনা সবার আগে বলা যাক।

বিষয়টাকে কাগজে কলমে ধরে রেখেছিলেন টমাস বার্থোলিন 1673 সালে। প্যারিসের একটি গরীব ঘরের মেয়ে রহস্যজনক ভাবে আগুনে পুড়ে মারা যায়। বছর তিনেক তার শরীরে পুষ্টি যত না গেছে, তার চেয়ে বেশি গেছিল সুরা। একদিন সন্ধ্যার পরেই খড়ের বিছানায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই রাতেই আগুন তাকে খেয়ে ফেলে। সকালবেলা পাওয়া গেল শুধু তার আঙুলের ডগাগুলো আর মুণ্ডটা। বাকি শরীর ছাই হয়ে গেছে।

আদালত বিমূঢ়

'এলিমেন্টস অফ মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স' ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল নিচের খবরটা।

ক্লড-নিকোলাস লা ক্যাট ফ্রান্সের নামী শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। রীমস্ অঞ্চলে একটা সরাইখানায় উনি থাকতেন. সরাইখানার মালিকের বউ ছিল বড় ঘ্যান ঘ্যানে প্রকৃতির। স্বভাবও বড় বাজে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার স্বামী।

1725 সালের 19 ফেব্রুয়ারি। রাত হয়েছে। সরাই-খানা গম্ গম করছে নানা রকমের লোকজনে। পরের দিন বড় মেলা আছে। তাই এত লোক সমাগম!

সরাইখানার মালিক জাঁ মিলেট ওপরতলার ঘরে শুতে

গেল। তার বউ নিকোলি এল নিচের তলায় রান্নাঘরে। কারণ, ঘুম আসছিল না।

রাত দুটোর সময়ে ঘুম ভেঙে গেল জাঁ মিলেটের। কোথায় যেন কি পুড়ছে—নাকে ভেসে এসেছে সেই গন্ধ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই হাঁকডাক শুরু করেছিল মিলেট। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দু-পাশের সব কটা ঘরের দরজায় দুমদাম করে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়েছিল ঘুমন্ত অতিথিদের। সদলবলে নিচের তলায় এসে দেখেছিল—না, সরাইখানায় আগুন লাগেনি—আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে মাদাম মিলেট। পোড়া দেহটা রয়েছে রান্নাঘরের আগুনের চুল্লির পাশে। মাথার খানিকটা, মেরুদণ্ডের খানকয়েক হাড় আর নিম্নপ্রত্যঙ্গে আগুন লাগেনি। দেহের নিচে কাঠের মেঝের সামান্য একটু অংশ পুড়ে গর্ত হয়ে গেছে, পাশেই যে চেয়ারটায় মাদাম মিলেট বসেছিল—সেটা একটু ঝলসেছে, কিন্তু ঘরের অন্য কোন কিছুতে আগুনের ছোঁয়া লাগেনি।

পুলিশ এল। বউকে খুন করার অপরাধে জ্যাঁ মিলেটকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। পুলিশের মতে, ঘ্যানঘেনে বউকে জ্যাঁ মিলেট নিজেই পুড়িয়ে মেরেছে। সুরার বোতল গায়ে উপুড় করে দিয়ে আগুন ধরিয়েছে। তারপর সরাইখানার সবাইকে ডেকে এনে তাই দেখিয়েছে।

ছোকরা ডাক্তার লা ক্যাট সরাইখানাতেই ছিলেন। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে উনিও দৌড়ে নিচে নেমে এসেছিলেন।

সাফ বলে দিলেন উনি, মানুষ এমন কোন আগুন আবিষ্কার করেনি আজও যে আগুন মাথা আর শরীরের প্রান্তদেশের প্রত্যঙ্গ পোড়াতে অক্ষম, কাছের বস্তু পোড়াতেও অক্ষম।

আদালত চেয়েছিল জাঁ মিলেটকে খুনী সাব্যস্ত করতে। করেও ছিল। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিল।

কিন্তু লা ক্যাট হাল ছাড়েন নি। আদালতকে বুঝিয়ে ছেড়েছিলেন, এ আগুন 'স্বাভাবিক' আগুন নয়—ভগবান এসে জেলেছিলেন। পাপীকে শাস্তি দিয়েছেন।

আদালত রায় বদলে নিল। জাঁ মিলেট বেকসুর খালাস পেল। কিন্তু মন ভেঙে যাওয়ায় শেষ জীবনটা হাসপাতালে কাটিয়েছিল।

ফেটে পড়ল নীল আগুন

'এডিনবরা মেডিক্যাল অ্যাণ্ড সার্জিক্যাল জ্যার্নাল' এর খবর। তারিখ : মার্চ, 1829।

খবরটা দিয়েছিলেন ডাক্তার ডিক্সন। ভাইয়ের জামা-কাপড়ে অকস্মাৎ আগুন ধরে যাওয়ার দাদা থাবা মেরে আগুন নিভোতে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নীল আগুন ফেটে বেরিয়ে এল নিজের হাত থেকেই। ঘণ্টা কয়েক ধরে জ্বলে-ছিল এই আগুন। জলের মধ্যে একনাগাড়ে ডুবেথাকায় তা নেভে।

সৈনিক পুড়ে ছাই

ইংল্যাণ্ডের কোলচেস্টারে খড়ের মাচায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল এক মদ্যপ সৈনিক। তারিখ : রবিবার, ফেব্রুয়ারি 19, 1888। পাওয়া গেল তাকে পুড়ে ছাই অবস্থায়—পাশের অতীব দাহ্য খড় কিন্তু একদম পোড়েনি, ঝলসায়নি।

এখবর ছাপা হয় বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে (এপ্রিল 21 1888, পৃষ্ঠা 841-42)।

নরদেহে হঠাৎ আগুন নিয়ে গবেষণা করে যিনি পৃথিবী বিখ্যাত, তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন অবশেষে। নাম তাঁর ডক্টর উইলটন এম ক্রগম্যান। পেনসিলভানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন-এর ফিজিক্যাল আনথ্রপলজিস্ট। বলেছিলেন—মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না। ব্যাপারটা ভাবলেই ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে যায় অজানা আতঙ্কে। জানি না মধ্যযুগে বাস করছি কিনা। ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভেল্কি হলেও আশ্চর্য হব না।"

সত্য ঘটনা যখন জলীক উপাখ্যানের চাইতেও বিস্ময়কর হয় :

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ-মশাল ঘটনা খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বলে বেশ ক'জন সাহিত্যিক মানুষ-মশাল চরিত্রদের নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

চার্লস ডিকেন্স অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখেন Bleak House। উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তাঁর পুরোনো বন্ধু জর্জ হেনরী লুয়েজ তাঁকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেন অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে উপন্যাসে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে। তেড়েফুঁড়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন চার্লস ডিকেন্স বেশ কয়েকটা মানুষ মশাল ঘটনার নজীর তুলে ধরে। মাডাম মিলেট আর কাউন্টেস ব্যাণ্ডির ঘটনা তার মধ্যে ছিল। এই আখ্যানে তা বর্ণিত হয়েছে।

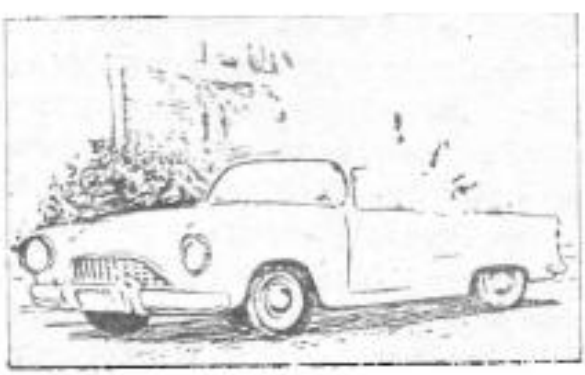

সাহিত্যে মানুষ-মশাল কাহিনী প্রথম পরিবেশন করেন (1798) আমেরিকার প্রথম ঔপন্যাসিক চার্লস ব্রকডেন ব্রাউন তাঁর Wicland উপন্যাসে। পুরোহিত বার্থোলির ঘটনা অবলম্বনে তিনি এই কাহিনী লিখেছিলেন।

1834 সালে ফ্রেডরিক ম্যারিয়াট লেখেন তাঁর উপন্যাস Jacob Faithful 1832 সালে প্রচারিত একটি মানুষ মশাল ঘটনার উপাদান থেকে।

শ্লেষবঙ্কিম লেখায় সিদ্ধহস্ত রাশিয়ান সাহিত্যিক নিকোলাই গোগোল 1842 সালে Dead Soul উপন্যাসে বর্ণনা দিয়েছেন একজন কামারের শোচনীয় মৃত্যুর—নীল আগুন বেরিয়ে এসেছিল তার শরীরের ভেতর থেকে।

'মবিডিক' উপন্যাস খ্যাত হারম্যান মেলভিল Redburn উপন্যাসটি প্রকাশ করেন 1849 সালে। সবুজ আগুনের শিখা বেরিয়ে এসেছিল একজন সাংহাইবাসী নাবিকের দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে—সেই আগুনই গ্রাস করেছিল তাকে।

রহস্যময় আগ্নেয় মৃত্যুকে কাজে লাগিয়েছেন মার্ক টোয়েন তাঁর Life on the Missisipi কেতাবে (1883)।

ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জোলা 1893 সালে লেখেন Le Docteur Pascal উপন্যাসটি। ঘুমন্ত অবস্থায় একজনের শরীর ভেদ করে কিভাবে নীল আগুন বেরিয়ে এসে তাকে পুড়িয়ে মেরেছিল, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। সবশেষে লিখেছেন—'ঠিক যেন অ্যালকোহলে চপচপে স্পঞ্জের মত পুড়ে গেল অ্যান্টনি ম্যাকার্ট।'

মানুষ হঠাৎ মশাল হয়ে যায় কেন ?

নরদেহের ভেতর থেকে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠার ব্যাপারটা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেন সংকলিত 'ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ'য়ে রোগ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়নি মানুষ-মশাল ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন-এর জৈব চিকিৎসা সম্পর্কিত সাহিত্য সূচী 'ইনডেক্স মেডিকাস'-য়ে কোন বিষয় শিরোনামা নয় মানুষ-মশাল। পুলিশ, দমকল কর্তৃপক্ষ, বীমা বিশেষজ্ঞ, করোনার এবং রোগ নিরূপণ বিদ্যায় পণ্ডিতরা সাক্ষী দাঁড়ালেও অধিকাংশ ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা সন্দেহাতীত এই ঘটনাগুলোকে স্রেফ উড়িয়ে দেন যথেষ্ট তদন্ত করা হয় নি—এই যুক্তি দেখিয়ে।

এ হেন অবিশ্বাস কিন্তু সব সময়ে ধোপে টেঁকেনি। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের হঠাৎ মশাল হয়ে যাওয়ার পেছনে ভগবানের হাত আছে বলে ধরে নেওয়া হত। অর্থাৎ একেবারেই অপার্থিব ব্যাপার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানে বিলক্ষণ প্রগতি হওয়ার ফলে গবেষকরা এই আপাতঃ অব্যাখ্যাত ঘটনাগুলোর পার্থিব কারণ নির্ণয়ে অগ্রণী হন। একাধিক সম্ভাবনার প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন ঃ

* অন্ত্রের গ্যাস দাহ্য।
* মড়া থেকে যে গ্যাস বেরয়, তা দাহ্য।
* খড়ের গাদা আর মিশ্রসার যে তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পারে, তাতে আপনা থেকেই আগুন লাগতে পারে।
* কিছু মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক বাতাসের সংস্পর্শে এলে আপনা থেকেই অগ্নিধারায় বিস্ফোরিত হয়। যেমন, ফসফরাস—যা নরদেহের একটি উপাদান।
* কিছু রসায়ন নিজেরা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটা মিশে গেলে বিস্ফোরকে পরিণত হয়।
* কিছু কীট আর মাছের গা থেকে দ্যুতি বেরয়. শরীরের ভেতরে 'আগুন' জাতীয় কিছু আছে বলেই নিশ্চয় তা হয়।
* নরদেহের চর্বি আর তেল জ্বালানি হিসেবে উৎকৃষ্ট শরীরে এদের পরিমাণ কম নয়।
* স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎ যে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে দেয়, তা বিশেষ কয়েক ক্ষেত্রে শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু রাশিকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে মনে হয়, উপরোক্ত সম্ভাবনাদের কোনটাই মানুষকে হঠাৎ মশালে রূপান্তরিত করতে পারে না। 1851 সালে একজন জার্মান কেমিস্ট জানিয়েছিলেন, আকণ্ঠ ব্র্যান্ডি খেয়ে আগুনের কাছে বসলেও শরীরে আগুন লাগে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জনাকয়েক চিকিৎসাবিদ বলেছিলেন, নরদেহে জল আছে বিস্তর, সে অনুপাতে চর্বি আছে অল্প—সুতরাং শরীর নিজেকে নিজেই জ্বালিয়ে নিতে পারে, এ তত্ত্ব মাথায় ঢুকছে না। সর্বশেষে, 1905 সালের 22 এপ্রিল 'আমেরিকান মেডিসিন' পত্রিকা আচ্ছাসে ঠুকে দিল মানুষ-মশাল হুজুগেদের ঃ "যতগুলো ঘটনার রিপোর্ট এসেছে, তার অর্ধেক পাঠিয়েছে বায়ুরোগাক্রান্ত ফ্রান্স।"

অ্যালকোহল শরীরকে প্রচণ্ড দাহ্য করে তোলে—এই অনুমিতি প্রমাণ করার জন্যে একটা ইঁদুরকে এক বছর ধরে অ্যালকোহলে ভিজিয়ে রেখে তারপর তার গায়ে আগুন দেওয়া হয়েছিল। দারুণভাবে জ্বলে উঠেছিল চামড়া, মাংসের বাইরের দিক কিছুটা পুড়েছিল, কিন্তু ভেতরকার কলাতন্তু আর দেহযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বললেই চলে। মিউজিয়ামে যে সব নমুনা অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখা হয় বছরের পর বছর, সেগুলোতেও আগুন লাগিয়ে একই ফল পাওয়া গেছে।

হতে পারে হজমের সময়ে শরীরে উৎপন্ন দাহ্য গ্যাস মানুষকে হঠাৎ মশালে পরিণত করতে পারে। একজন

ইংরেজ ধর্মযাজকের পেটে গ্যাস জমেছিল বলে তাঁকে বারণ করা হয়েছিল, তিনি যেন ফুঁ দিয়ে বেদীর মোমবাতি নিভোতে না যান—নিঃশ্বাসে আগুন ধরে যেতে পারে।

স্থির বিদ্যুৎ অন্যান্যদের তুলনায় আগুন ধরাতে অধিকতর সক্ষম বলে মনে হয়—কিন্তু তারপর জ্বালানি হবে কোন জিনিস, সেটা অবশ্য আলোচনা সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অগ্নিনিরোধক সমিতি প্রকাশিত কেতাবে বলা হয়েছে, নরদেহে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে পারে। ব্যক্তি বিশেষে তা 30,000 ভোল্ট পর্যন্ত উঠতে পারে। চুল থেকে এই বিদ্যুৎ বেরিয়ে গেলে সাধারণতঃ তা ক্ষতিকর নয়, কিন্তু উদ্বায়ী পরিবেশে, যেমন কলকারখানার দাহ্য পদার্থের ধারে কাছে, অথবা হাসপাতালের অপারেটিং রুমে গ্যাসীয় ঘুমপাড়ানি ওষুধের সান্নিকটে—এই বিশেষ ব্যক্তিরা স্পার্ক বৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিতে পারে। তবে, এই ধরনের বিস্ফোরণ শুধু একজন লোকই পুড়ে ছাই হয়েছে ঘর এবং আসবাবপত্রে আঁচটুকুও লাগেনি—এমন নজীর আজও শোনা যায়নি।

আরও কিছু কারণের উল্লেখ করেছেন মানুষ-মশাল বিশ্বাসীরা। যেমন, আগুনের গোলা (ফায়ার বল), বজ্রপাত অভ্যন্তরীণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ, লেসার রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ, হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ এবং জিও-ম্যাগনেটিক প্রবাহ। কিন্তু এগুলো কার্যকর হয় কি প্রক্রিয়ায়—তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না মানুষ-মশাল রহস্যেরও।

আগামী সংখ্যার
অশান্ত আকাশ রহস্য

কেন্দ্রীয় সংবাদ পত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (1956)8 ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল :

1. **প্রকাশ স্থান :** 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9
2. **প্রকাশ কাল :** মাসিক
3. **প্রকাশক ও মুদ্রাকর :** রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক
4. **সম্পাদক :** রবীন বল
5. যে সকল ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা এঁদের নাম ও ঠিকানা

(ক) **মালিক :** রবীন বল, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9

আমি রবীন বল এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন বল, প্রকাশক, 29 ফেব্রুয়ারী 1988

ঘোষণা

মাসিক কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয় 30 এপ্রিল 1981। পরবর্তী সংখ্যা মে মাসে প্রকাশিত না হয়ে জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই হিসেবে বর্ষশেষ সংখ্যা মার্চ মাসেই হওয়া উচিৎ। এবার থেকে এপ্রিল-মার্চ এই হিসেবেই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের বর্ষ গণনা করা হবে।

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সচিত্র ছড়া ও কবিতার বই

"অষ্টপ্রহর"

ভূমিকা—অমিতাভ চৌধুরী
প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী
বোর্ড বাঁধাই—মূল্য ৬ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ১০৯, বি. বি. চ্যাটার্জী রোড কলিকাতা-৪২

অক্সিজেন

অমরনাথ রায়

রসায়ন বিজ্ঞান গড়ে ওঠার মূলে যে সব মৌলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে অক্সিজেন অন্যতম। অক্সিজেন পর্যায় সারণীর অষ্টম মৌল। পর্যায় সারণীর VI B শ্রেণীতে এর অবস্থান। অক্সিজেনের চিহ্ন O, আণবিক সংকেত O_2, পরমাণু $1s^2\ 2s^2\ 2P^4$, শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় এবং এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এই মৌলিক গ্যাসটির ঘনত্ব 1·429 গ্রাম/লিটার, তরল অক্সিজেনের ঘনত্ব 1·142 গ্রাম/মি.লি এবং কঠিন অক্সিজেনের ঘনত্ব গলনাংকে 1·27 গ্রাম/মি.লি./এর স্ফুটনাংক = 183°C এবং গলনাংক = 218·9°C. অক্সিজেনের সমস্থানিক (আইসোটোপ)-এর সংখ্যা ছয় এবং যোজ্যতা 2. 1774 খ্রীস্টাব্দ ও তার কাছাকাছি সময়ে প্রায় একই সঙ্গে সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলি, ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী এবং ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। অক্সিজেন নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে, যার অর্থ "অ্যাসিড উৎপাদক'। প্রকৃতির মধ্যে অক্সিজেনের অবস্থান সবচেয়ে বেশি। ভূপৃষ্ঠের প্রায় 46·6% হলো অক্সিজেন। আবার আয়তন হিসাবে বায়ুর 20·69% অক্সিজেন। মহাজগতেও অক্সিজেন আছে। তবে তার বেশির ভাগই আছে নেবুলায়, নক্ষত্রে এবং মহাজাগতিক অংশ বা Space এ।

অক্সিজেনের প্রধান উৎস হলো বাতাস, জল এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ যৌগ (যথা পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং বিভিন্ন পার-অক্সাইড)। রসায়নাগারে পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডকে অনুঘটক রূপে ব্যবহার করে উত্তপ্ত করে (প্রায় 250°C উষ্ণতায়) অক্সিজেন পাওয়া যায়। গ্যাসটি জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। অক্সিজেনের পণ্যোৎপাদন করা হয় প্রধানতঃ তরল বাতাস ও জলকে তড়িৎ বিশ্লেষিত করে।

সাধারণ অবস্থায় অক্সিজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস, বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী ও জলে সামান্য দ্রাব্য। অক্সিজেন দহন ও শ্বাসকার্যের সহায়ক কিন্তু নিজে অদাহ্য। অক্সিজেনের অণু দ্বি-পরমাণুক। অধিক উচ্চতায় অক্সিজেনের অণু ভেঙ্গে গিয়ে পারমাণবিক অক্সিজেন উৎপন্ন করে, যা খুব শক্তিশালী জারক। অক্সিজেনের বহুরূপতা ধর্ম আছে। ওজোন (OZONE) এবং অক্সিজেন একই পদার্থের দুটি রূপভেদ। ঊর্ধ্বাকাশে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন ওজোনে পরিণত হয়। একটি ওজোনের অণুতে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান। ঊর্ধ্বাকাশে ওজোনের একটি স্তর সৃষ্টি হওয়ার ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির একটি বড় অংশ পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছুতে পারে না। সেটা পৃথিবীর জীবের পক্ষে অমঙ্গলদায়ক। কারণ অতিবেগুনী রশ্মি জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক।

সমযোজ্যতার দ্বারা দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠন করে। সাধারণ অক্সিজেনের মধ্যে তিন রকম আইসোটোপ আছে $8O^{16}$, $8O^{17}$, এবং $8O^{18}$, সাধারণ অক্সিজেনের মধ্যে এই আইসোটোপগুলির শতকরা অনুপাত যথাক্রমে 99·76%, O.O4% এবং O·2% এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে 14, 15 এবং 19 ভর-সংখ্যাবিশিষ্ট আরও তিনটি সমস্থানিক প্রস্তুত করা হয়েছে, যাদের অর্ধ-আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম। প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন দহন ও শ্বাসকার্যে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ মোটামুটি স্থির, কারণ ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস, হ্যালোজেন এবং গোল্ড প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি মৌল ছাড়া প্রায় সকল মৌলিক পদার্থের সঙ্গেই অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। অক্সিজেন যুক্ত যৌগগুলির নাম 'অক্সাইড'। অক্সিজেন ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্ষারীয় অক্সাইড এবং অধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে 'আম্লিক অক্সাইড' গঠন করে।

অক্সিজেনের অপর নাম অ্যাসিড উৎপাদক। কারণ দেখা গেছে যে কার্বন, সালফার, সালফারাস প্রভৃতি অধাতুর রাসায়নিক সংযোগে যে অক্সাইডসমূহ গঠিত হয় তাদের জলে দ্রবীভূত করলে অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধাতু হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জল প্রশম পদার্থ। কাজেই সর্বক্ষেত্রে অক্সিজেনের 'অ্যাসিড উৎপাদক' নামটি

প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন অনুঘটকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সক্রিয়তা বাড়ে। তার ফলে নানা যৌগ জারিত হয়, যেমন প্ল্যাটিনামযুক্ত অ্যাসবেস্টসের উপস্থিতিতে 450°C উষ্ণতায় সালফার ডাই অক্সাইড জারিত হয়ে সালফার ট্রাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। আবার অ্যামোনিয়া 700°C উষ্ণতায় প্ল্যাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

উচ্চ উষ্ণতায় গোল্ড, সিলভার, প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি অক্সিজেন অধিশোষণ করে। পরে ধাতুগুলিকে ঠাণ্ডা করলে শোষিত অক্সিজেন বেরিয়ে যায়। পটাসিয়াম পাইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় দ্রবণ কিংবা অ্যামোনিয়া-যুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাসকে দ্রুত শোষণ করে।

অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা, যার উষ্ণতা 3000°C বিভিন্ন ধাতু গলাতে, ঝালাইয়ের কাজে এবং পুরু লোহার পাতকে কাটতে ব্যবহৃত হয়। প্রাণিজগতের অস্তিত্বের মূলে আছে অক্সিজেন, কারণ, অক্সিজেন শ্বাসকার্যে সহায়তা করে। সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের পণ্যোৎপাদনে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন মরণাপন্ন রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্যে রোগীকে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করা হয়। রকেট উৎক্ষেপণের জন্যে জ্বালানীর দহনের জন্যেও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত নবম ও দশম শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায়
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

ভৌতিক কাণ্ড ও বিজ্ঞান

সুজাতা চট্টোপাধ্যায়

কালীপূজোর দিন সন্ধেবেলায় আমরা তিন ভাইবোন পাশের গ্রাম থেকে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরছি। সামনেই পড়বে আমাদের সেই কুখ্যাত মাঠ। কুখ্যাত মাঠ এই কারণেই যে ওখানে অনেকে অনেক রকম ভৌতিক কাণ্ড দেখেছেন এবং শুনেছেন, এমন কি অনেকে মারাও গেছেন। এককালে ওখানে ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত ছিল। এখনও আশপাশের গ্রামের যত গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি মারা যায় ওখানেই একটা বিরাট পুকুরের ধারে ওগুলো ফেলা হয়। গ্রামের গরীব ঘরের মৃত সন্তানদেরও ঐ পুকুরের ধারে মাটির তলায় চির নিদ্রার জন্য শুইয়ে দেন তাদের আত্মীয়রা।

আমরা তিনটি প্রাণী সন্ধের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছি ঐ পুকুর এবং গ্রামের বন্যাত্রাণ-আবাসের (ফ্লাড শেল্টার) দিকে। আমার একপাশে বোন এবং অন্যপাশে ভাই। দুজনেই হাত চেপে ধরেছে। আমিও টর্চটাকে বেশ শক্ত করে ধরে রাস্তার মাঝে তীব্র আলো ফেলে এগিয়ে চললাম। এবারে ঐ পুকুরটার পাড় দিয়েই যাবো। ভাই বলে উঠল দিদি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্? শব্দটা আমিও শুনতে পাচ্ছিলাম। কেমন যেন এলোমেলো উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। যত এগিয়ে যাচ্ছি শব্দটা তত জোরে বেজে উঠছে। বুঝতে পারলাম ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়েছে। বোন বলে উঠল এদিকে তো ভূতের আস্তানা আছে। বাজনাটা ভূতের নয় তো?

ওদের দুজনকে অভয় দিয়ে আমরা চলে এলাম পুকুর এবং বন্যাত্রাণ আবাসের কাছে—বাজনাটা আর শোনা যাচ্ছে না। ওদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলাম, কই তোদের ভূতের বাজনা? ভাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল রামনাম করছি যে। ওর কথা শুনে ঐ ভয়ের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল। পুকুর ও বন্যাত্রাণ আবাস পেরিয়ে বেশ কিছুটা চলে এসেছি বাজনাটা আবার শোনা যাচ্ছে—অবাক হলাম। আমার মুঠির মধ্যে ভাই এবং বোনের হাত কাঁপছে। এক ধমক দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে পা চালাতে বলতেই ওরা আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে দিলো। আমার প্রাণ তখন আত্মা রাম খাঁচা।

বাড়ির কাছে এসে ছোটা বন্ধ করলাম। বাড়ি এসে তিনজনেই জামাকাপড় ছেড়ে, জল খেয়ে স্বস্তি পেলাম।

আমার পড়ার ঘরে বসে আছি। শুনতে পেলাম পাশের ঘরে ভাইবোন দুজনেই বাবাকে তাদের ভূতের বাজনার গল্প শোনাতে বসেছে। বাবা সবাকছু শুনে ভাইয়ের উদ্দেশে বলে উঠলেন 'প্রতিধ্বনি' কথাটা বোঝ? একলা ঘরের মধ্যেও চমকে উঠলাম—সত্যই তো এতক্ষণ তো আমার খেয়াল ছিল না যে সন্ধের সময় সমস্ত পূজোমণ্ডপে সন্ধেবাজনা বাজে। আমাদের পাশের গ্রামেও নিশ্চয় তখন সন্ধেবাজনা বেজেছিল আর সেই বাজনা বন্যাত্রাণ আবাসের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে তার ফলে 'প্রতিধ্বনি'র সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিধ্বনি খুব কাছ থেকে শুনতে পাওয়া যায় না তাই পুকুরটা পার হওয়ার সময় ঐ বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম না। বিভিন্ন ধরনের বাজনা এলো মেলো শোনাচ্ছিল।

এই বিজ্ঞান-সত্য জেনে গিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠলাম। উঃ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তখন। মনে মনে বাবাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম।

পুরুলিয়া মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, নবম শ্রেণী।

খেলার টুকিটাকি অজয় দাশগুপ্ত

একটি মাত্র টেস্ট খেলেই লাখ টাকা রোজগার করে ফেলল নরেন্দ্র হিরওয়ানি। এমন ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। আবির্ভাবেই রেকর্ড। আর রেকর্ডের পরিবর্তে টাকা। ভিভ রিচার্ডের একটা কথা এখানে তোমাদের জানিয়ে রাখি। হিরওয়ানি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রতিভা না থাকলে রেকর্ড করা যায় না। কথাটার সত্য মিথ্যা ভবিষ্যৎ বলবে। এখন যা বলার, তা হল প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে 16 উইকেট পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বব ম্যাসি। 1971 সালে তিনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে এই রেকর্ড করেন দু-ইনিংসে মাত্র 137 রান খরচ করে। হিরওয়ানি ম্যাসির সেই রেকর্ড ছুঁয়েছে মাত্র। উল্লেখযোগ্য তার রান খরচ সামান্য কম—দু-ইনিংসে 136। 19-এর কম বরসী এই কিশোর ক্রিকেটারের আগামী দিন সফল হোক এই কামনা করি।

বিশ্বনাথ ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন। তিনি আর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলবেন না। 1969 সালে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে প্রথম আবির্ভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শতরান করেন। ভারতীয় দলে একটি প্রচলিত অভিশাপ ছিল আবির্ভাবে শতরান করলে পরে সেই খেলোয়াড় আর শতরান পাবেন না। বিশ্বনাথের আগে এই তালিকায় লালা অমরনাথ আব্বাস আলি বেগ দীপক মোইন হনুমন্ত সিং-রা ছিলেন। অভিশাপের গণ্ডী থেকে বিশ্বনাথ বাইরে বেরিয়ে এলেন। 15 বছর একটানা জাতীয় দলের সেবা করে 91টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন বিশ্বনাথ। তাঁর রান সংখ্যা 6080। এর মধ্যে 14 টি শতরান। 35টি অর্ধশত রান। তিনি দুটি টেস্টে ভারতের হয়ে অধিনায়কত্ব করেন।

অধিনায়ক রূপে গুণ্ডাপ্পা রঙ্গনাথন বিশ্বনাথ একটি বিশেষ নজির সৃষ্টি করেছিলেন। জুবিলি টেস্টে ইংলণ্ডের বব টেলরকে আম্পায়ার আউট দিলে তিনি তা মেনে নেন নি। টেলরকে আবায় খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃত ক্রিকেটারের এই আচরণ ক্রিকেট দুনিয়াকে বিস্মিত করেছিল।

নেহরু কাপ ফুটবল হয়ে গেল শিলিগুড়িতে। বিদেশী দলগুলোর কাছে ভারত পর পর হারবে এটাই সবার জানা ছিল। শুধু আমরা জানতাম না পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত হঠাৎ এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেবে। হ্যাঁ, পুরো 90 মিনিটের খেলায় ভারত আগে গোল দিয়ে খেলাটি অমীমাংসিত রাখে। এটা দুর্ঘটনাই, কারণ তারপর এশীয় কাপে সকলের কাছেই ভারতীয় দল মাথা নিচু করল সহজেই। হায় স্বদেশী ফুটবল!

1988 অলিম্পিক বছর। এবার এশিয়ার সোল শহরে অলিম্পিকের আসর বসছে। সোল হল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী। সারা বিশ্বে চলছে অলিম্পিকে যোগদানের প্রস্তুতি। ভারতীয় সোনার হরিণী ঊষা অলিম্পিক থেকে সোনা তুলে আনবেন এ আশা আজ দূরে সরে গেলেও সরাসরি নাকচ করা যায় না। দেখা যাক কি হয়।

কলকাতার ফুটবল মাঠে পি. কে. ব্যানার্জি আবার কোচ রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। তিনি নতুন করে ইস্ট বেঙ্গলের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন। একটা কথা ভাবলে ভারি মজা লাগে। বড় বড় এই সব মানুষদের কথাবার্তায় মিল পাওয়া যায় না। পি. কে. ব্যানার্জি বা যে কেউই হোক না কেন কলকাতার ফুটবল যে তার আকর্ষণ হারাচ্ছে এটা আমার মতো কলকাতার অনেকেই বুঝে গিয়েছেন। উন্নত মানের খেলোয়াড় ছাড়া শুধু কোচ হলেই হবে না—মানুষ বিরক্তির বদলে আর টাকা খরচ করতে রাজি নয়। অবসর নিয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেট নায়ক ইমরান খাঁ আবার খেলায় ফিরছেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়ার অনুরোধ নাকি তাঁকে মাঠে ফিরিয়ে আনছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এই অনুরোধই প্রথম নয়। জিয়া দ্বিতীয় বার অনুরোধ করলে তা আর ইম্মি ফেলতে পারেন নি। আগামী টুরে ইমরান পাকিস্তান দল নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছে।

গতবারের ডেভিস কাপ রানার্স ভারতীয় দল এবার তাদের প্রথম খেলাতেই হেরে গেল। কৃষ্ণান নিজের দেশের মাটিতে সেই খেলা দেখাতে পারলেন না যা তাকে আন্তর্জাতিক টেনিস জগতে খ্যাতি এনে দিয়েছে। যুগোস্লাভ দল ভারতের বিরুদ্ধে সহজেই জিতে গেল। আসলে বিনয় অমৃতরাজের পর ওই ধরনের কোনো খেলোয়াড় ভারতীয় টেনিসে উঠে আসছে না। এখন ভাবার কথা—এরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো খেলোয়াড় কই! ইন্দিরা গান্ধী গোল্ড কাপ হকিতে ভারতের অবস্থা কী শোচনীয় তা বোঝা গেল। এক কালের বিশ্ববিজয়ী দল আজ সকলের কাছেই হারছে। পাকিস্তানও হকিতে ভারতের মতো অবস্থায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান থমকে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সম্পূর্ণ তরুণদের নিয়ে দল গঠন করে তারা আবার দেখিয়ে দিল হকি খেলায় তাদের উৎকর্ষতা। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে দাঁড়াতেই দেয়নি এই দলটি। অথচ কিছুদিন আগে এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়াই বাজীমাৎ করেছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়—পাকিস্তানে ওপরতলার দলাদলি ভারতের মতো নয় বলেই এমন ফলাফল সম্ভব হয়েছে।

শেষ করবার আগে একটা প্রশ্ন রাখলাম। আগামী সংখ্যায় উত্তর জানাব। ফুটবলে ভোকাল টনিক কথাটার মানে কি? কার ব্যাপারে এই কথাটা ময়দানে চালু হয়?

শব্দকূট

অভিজিৎ আচার্য এপ্রিল '৪৪

সূত্র—পাশাপাশি

(1) 'শিলা' কে আঞ্চলিক ভাষায় যা বলা হয়। (3) উদ্ভিদ বিদ্যা (5) একটি রাশি (৭) ভারতের একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। (7) মানুষের একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। (8) পাহাড়ে উঠতে যারা অভ্যস্ত। (10) জলে দ্রবণীয় হলে যার জলীয় দ্রবণ সাধারণত টক বা অম্লস্বাদযুক্ত হয়। (12) একটি দেশ। (13) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানকে যা বলা হয়। (14) 'Nad'কে সাধারণ ভাষায় যা বলা হয়।

সূত্র উপর নিচ

(1) তরল ধাতু। (2) ভারতীয় বিজ্ঞানী। (3) রসায়ন-শাস্ত্রে ABC এর 'B' বলতে যা বোঝায়। (4) নিষ্ক্রিয় গ্যাস। (8) অ্যালগি। (9) একটি উদ্ভিদের নাম। (10) পরস্পর বিপরীত ধর্মী জিন। (12) 12 টার মোট সংখ্যাকে যা বলা হয়।

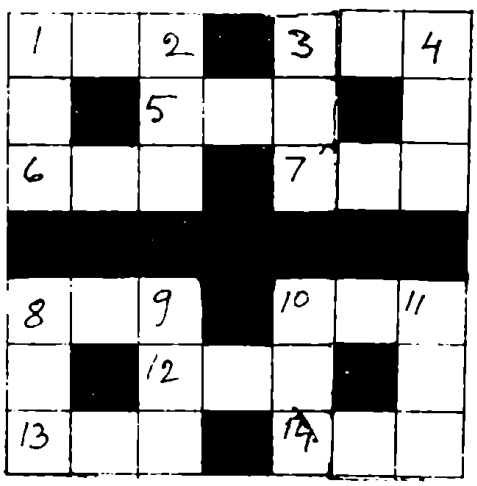

আই কিউ টেস্ট এপ্রিল '৪৪

1. স্বাভাবিক রীতিতে সাজাও —

(a) যাও, (b) দাঁড়াও, (c) দেখো

2 জিংক সালফাইড ও লঘু HCl-এর বিক্রিয়ায় নিচের কোনটি উৎপন্ন হয়—

(a) SO_2, (b) Cl_2, (c) H_2S

3. হিমের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটারের ক্রিয়া যে পদার্থ অথবা পদার্থগুলির তাপীয় প্রসারণের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হলো—

(a) অ্যালকোহল. (b) পারদ. (c) পারদ এবং অ্যালকোহল. (d) ইস্পাত

4. এদের মধ্যে কোনটি দলছাড়া—

কাঁচি, ঢেঁকি. ছুঁচ, দাঁড়িপাল্লা

5. পরবর্তী সংখ্যাটি কি হবে—

10, 11, 9, 12, 8,

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

ফেব্রুয়ারি' ৪৪ গ্রেড I

1. অণু 2. 1909 সালে। 3. সালফিউরিক অ্যাসিড। 4. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 6 প্রতি চার বছর অন্তর। 7. বিজয় মার্চেন্ট। অ্যাগারিকাস। 1/10 সেকেণ্ড। বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় (প্রাক্তন) মনসুর আলি খান পাতৌদি।

ফেব্রুয়ারি' ৪৪ গ্রেড II

1. বেইটন কাপ। 2. সিংহ ও সূর্য। 3. 32 ফিট। 4. নায়গ্রা জলপ্রপাত। 5. উইলিয়ম শেক্সপিয়র। 6. চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। 7. সিনাবার, HgS. 8. ENTOMOLOGY. 9. মাই-টোকনড্রিয়া। 10. গঙ্গা।

ফেব্রুয়ারি' ৪৪ গ্রেড III

1. 30,000 কিলো ক্যালোরি। 2. $85=2^2+9^2$ $85=6^2+7^2$ 3. 84 কি. গ্রা। 4. Pyridoxine 5. আলোক 6 473°c 7- 1974 সাল থেকে। 8. শিবরাম চক্রবর্তীকে 9. হংকং-এ। 10. বাঁদিকে হেনরি ফোর্ড এবং ডানদিকে টমাস আলভা এডিসন।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট / ফেব্রুয়ারী ৪৪-এর সমাধান

1. MEANINGFUL
2. (b) সালফাইড 3. (b) 5 ঘণ্টা
4. দুধ বাদে বাকী সবকটি কার্বনের যৌগ।
5. 6 প্রত্যেক লাইনের বাঁ দিকের সংখ্যা থেকে মাঝের সংখ্যাটি বিয়োগ করলে ডান দিকেরটি পাওয়া যায়।

শব্দকূট সমাধান

মার্চ '৪৪

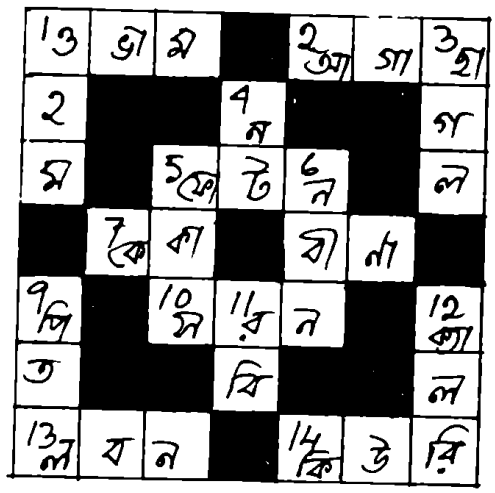

মোটর সাইকেল

ছোটবেলা থেকে জিজা দারুণ সাহসী। প্রায় এক বছর বয়স থেকেই মোটর সাইকেলে চেপে বাবা মা'র সঙ্গে দিব্যি বেড়াতে যেত। কখনো ওকে ভয় পেতে বা কান্নাকাটি করতে দেখিনি। বরাবর বাবা যখন জোরে মোটর সাইকেল চালাত জিজা ফুর্তিতে হিহি করে হাসত মাঝে মাঝে অকারণ হর্নটা বাজিয়ে দিত। সে আজ চার বছর আগের কথা। জিজা এখন অনেক বড় হয়েছে। ওর বাবাও এখন মোটর সাইকেল ছেড়ে গাড়ী কিনেছেন। কিন্তু মোটর সাইকেলকে জিজা আজও ছোটবেলার মতই ভট্‌ভটি বলে। সেদিন খুব উত্তেজিত হয়ে আমায় এসে বলতে আরম্ভ করল, "জানো কাকু, আমাদের স্কুলবাসটার সামনে একটা নীল রঙের ভট্‌ভটি..." আমি তার রোমহর্ষক গল্পের প্রস্তাবনাটা থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ভট্‌ভটি কি? মোটর সাইকেল বল।" ও বলল, "কেন মোটর সাইকেল কেন?"

মোটর সাইকেল কেন বললে তো অনেক কথাই বলতে হয়। আসলে সাইকেলের সঙ্গে ইঞ্জিন জুড়ে তৈরি হয়েছিল মোটর সাইকেল। তৈরি করেছিলেন গটলিএব ডোমলার, 1885 খ্রীস্টাব্দে। মোটর সাইকেল কাজ করে সাইকেলেরই মত। শুধু পায়ের বদলে ইঞ্জিন দিয়ে চালাতে হয়। পেছনের চাকাটা একটা চেনের সাহায্যে ইঞ্জিনের ক্ষমতায় চলে। আর সামনের চাকা ঘোরে পেছনের চাকা ঘোরার জন্যই। সামনের হ্যাণ্ডেল দিয়ে মোটর সাইকেলকে ইচ্ছেমত দিকে ঘোরানো যায়। জানদিকের হ্যাণ্ডেল-এ থ্রটল বলে একটা জিনিস থাকে সেটায় কতটুকু গ্যাস ঢুকবে বের হবে সেটা ঠিক করে।—এইভাবেই মোটর সাইকেল-এর গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্রেক আছে দু'ধরনের। হ্যাণ্ড ব্রেক সামনের চাকার জন্য আর পেছনের চাকার জন্য ফুট ব্রেক।

এতদূর শোনা মাত্রই জিজা তাড়াতাড়ি বলল হ্যাঁ বুঝেছি। তারপরেই বলল, তারপর শোনোনা কাকু, সেই নীল ভট্‌ভটিটা না সাঁ করে ....বুঝলাম আজ আমার জিজার গল্প না শুনে উপায় নেই। ব্যাজার মুখ করে বললুম, "তারপর?"

অভয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের জানুয়ারি '৪৪ সংখ্যা থেকে আগামী তিন বছর বিনামূল্যে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি সংখ্যা পাঠানো হয়। সংখ্যাগুলি পাঠানো হবে—আওার সার্টিফেকেট অব পোস্টিং-এ। শারদ সংখ্যা হাতে সংগ্রহ করতে হবে। যারা সাধারণ সংখ্যা হাতে নিতে চাও তারা দপ্তরে যোগাযোগ কর। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ঐ অনুষ্ঠানে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও উপহার অর্পণ করা হবে। যারা যোগদান করতে চাও দপ্তরে যোগাযোগ কর।

পরিচালক
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সফল উত্তরদাতাদের নাম

ফেব্রুয়ারি '88-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **কুন্তল অধিকারী**, শান্তিনগর (পলতা বেঙ্গল) এনামেল, 24-পরগনা 743 122। 2. **অনির্বাণ দাস**, প্রযত্নে, সুখরঞ্জন দাস, 9/H-9, অশ্বিনী নগর বাগুইআটি, কলকাতা-700 059। 3. **মহাম্মদ বাসারাতুল্লাহ**, প্রযত্নে, মহাম্মদ ওবায়েদুল্লা গ্রাম+পোস্ট-অজুনা, জেলা-বর্ধমান। 4. **সুমন কুমার দাস**, 24, নন্দলাল বোস লেন, কলকাতা-700 003। 5. **মহুয়া ঘোষ**, প্রযত্নে, পি. এস. ঘোষ, 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-54
6. **বিকাশ বিশ্বাস**, প্রযত্নে, বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, ফুলিয়া স্টেশন পাড়া, পোস্ট-বেলেমাঠ, জেলা-নদীয়া-741402।
7. **অরুণাংশু কুমার ঘোষ**, প্রযত্নে, হিমাংশু ঘোষ, গ্রাম-বেতাগড় পোস্ট-পাড়াতল, জেলা-বর্ধমান।
1. **রাজেশ শেঠ**, প্রযত্নে, ভোলানাথ শেঠ, পোস্ট-বাঁশবেড়িয়া, জেলা-হুগলী।
9. **অর্পিতা সরকার**, প্রযত্নে, পি. এল. সরকার, এম. এম. ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
10. **বুলা সাহা**, প্রযত্নে, হরিবল্লভ সাহা, হাসপাতাল রোড, পোস্ট-কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম-দিনাজপুর, পিন-733 129।

ফেব্রুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কৃত হবে :

1. **অনির্বাণ দাস**, প্রযত্নে, সুখরঞ্জন দাস, 9/H-9, অশ্বিনীনগর, বাগুইআটী, কলকাতা-700059।

ফেব্রুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **তরুণতপন গরাই**, প্রযত্নে, শরৎকুমার গরাই, সাহেব বাগান রোড, গুমকরা, বর্ধমান।
2. **সিদ্ধার্থ দাস**, প্যারীমোহন দাস, গুমকরা, বর্ধমান।
3. **মিঠু ঘোষ**, গ্রাম-মামালিয়া, (পালপাড়া), পোস্ট-বাখরাহাট, দঃ 24-পরগনা-743 377।

ফেব্রুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : গৌতম দে, **24-পরগণা :** সঞ্জয় দালাল, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, **হুগলী :** অতনু শেঠ, **নদীয়া :** সুশোভন বিশ্বাস।

* ফেব্রুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সঠিক উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

ঘোষণা

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সপ্তম বার্ষিকী পূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আগামী 7মে 1988।

স্থান ঃ মহাবোধি সোসাইটী হল। সময় সন্ধ্যা 6টা।

গত এক বছরে প্রকাশিত মডেল নির্মাতাদের দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান সূচী মে '88 সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ স্থান, সময় ও তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে!

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে কুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI-VII VIII, IX-X ও XI-XII। ফটো কুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না ;

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মার্চ '88 সংখ্যার
কুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড 1 **সুধাংশু পাত্রের**
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

গ্রেড2 **দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়**
পৃথিবী পরিচয়

গ্রেড 3 **রতন মোহন ধাঁ**
আরও গণিত কুইজ

প্রতিযোগিতার কুপন

কুইজ কনটেস্টগ্রেড—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি .....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স.....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

নাম রাখা হয়েছে 'ভেইনু-বাপ্পু দূরবীন'। 1982 সালের 19 আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

11 **এপ্রিল** 1984, প্রথম ভারতীয় মহাকাশ যাত্রি স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মা প্রায় আট দিন স্যালিয়ুত মহাকাশ কেন্দ্রে কাটাবার পর দুই সোভিয়েত সহযাত্রির সঙ্গে আজ পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

12 **এপ্রিল** 1961, এই দিন মানুষ প্রথম মহাকাশে পাড়ি জমায়। সোভিয়েত রাশিয়ার 27-বছর বয়স্ক তরুণ য়ুরি গ্যাগারিন (Yuri Gagarin) একটি ভস্তক (Vostok) মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীর কক্ষ-পথে 108 মিনিটে এক পাক খেয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় থাকাকালীন গ্যাগারিন খাওয়া, পান করা এবং লেখা ইত্যাদির সফল চেষ্টাও করে দেখেছিলেন।

12 **এপ্রিল** 1981, এইদিন মানুষের মহাকাশ জয়ের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আমেরিকার স্পেস শাট্‌ল্ 'কলম্বিয়া' (Space Shuttle 'Columbia) এই দিন ভারতীয় সময় রাত 11·50 মিনিটে প্রথম মহাকাশযাত্রা শুরু করে। 'কলম্বিয়া' হলো বিশ্বের প্রথম এমন মহাকাশযান যা রকেটের মতো আকাশে ওড়ে কিন্তু এরোপ্লেনের মত ডানায় ভর করে মাটিতে ফিরে আসে। এতে প্রধান সুবিধে এই একটি শাট্‌ল্‌কে বার বার মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে যার ফলে খরচ পড়ে সাধারণ রকেটের তুলনায় অনেক কম। 'কলম্বিয়া'র প্রথম দু'জনযাত্রী ছিলেন জন ইয়ং (John Yonng) এবং রবার্ট ক্রিপেন (Robert Crippen)। প্রায় 54 ঘণ্টাকাল ধরে ভূপৃষ্ঠের 300 কিলো-মিটার ওপরে কক্ষ-পথে ঘোরার পর 'কলম্বিয়া' নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে। কলম্বিয়ার পর আরও তিনটি শাট্‌ল্, যথাক্রমে 'চ্যালেঞ্জার' (Challenger), ডিস্‌কভারি' (Discovery) এবং 'অ্যাট্‌লান্টিস্' (Atlantis) নিয়মিতভাবে একাধিক বার মহাকাশে পাঠানো হয়। তাদের সাহায্যে বহু উপগ্রহ কক্ষপথে ছাড়া হয় এবং কয়েকটিকে কক্ষপথ থেকে ফিরিয়ে এনে মেরামতও করা হয়। 1986 সালের জানুয়ারি মাসে উৎক্ষেপণের সময় সাতজন যাত্রী সমেত 'চ্যালেঞ্জার' শাট্‌ল্'এ বিস্ফোরণের আগে পর্যন্ত মোট চল্লিশ বার চারটি শাট্‌ল্‌কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

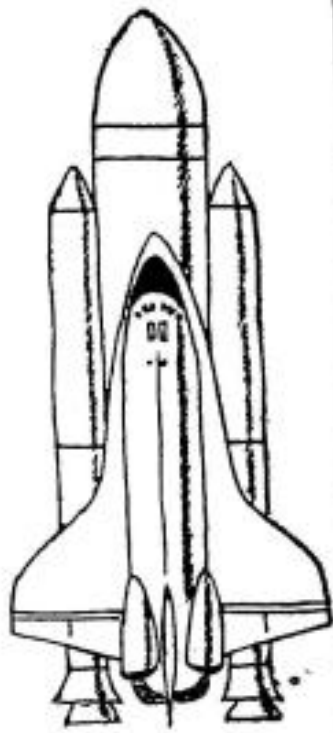

12 **এপ্রিল** 1984, এইদিন সর্বপ্রথম কক্ষপথ থেকে একটি অকেজো উপগ্রহকে নামিয়ে এনে মেরামত করা হয়। উপগ্রহটির নাম ছিল 'সোলার ম্যাক্স' (Solar Max)। এটিকে কক্ষপথ থেকে নামিয়ে এনে মেরামত করতে স্পেস্ শাটল্ 'চ্যালেঞ্জারের' দু'জন যাত্রীকে শাট্‌লের বাইরে মহাশূন্যে প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টা কাটাতে হয়।

16 **এপ্রিল** 1972, এইদিন তিনজন যাত্রীসহ 'অ্যাপোলো-16' চন্দ্রযানকে চাঁদ অভিমুখে ছাড়া হয়।

17 **এপ্রিল** 1983, এইদিন ভারতের শ্রীহরিকোটা থেকে চতুর্থ ও শেষবারের মত এস এল. ভি-তিন (SLV-3) রকেট ছাড়া হয় যা 41.5 কিলোগ্রাম ওজনের একটি রোহিণী (Rohini-D2) উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে 4000-850 কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে প্রতি 99 মিনিটে একবার পরিক্রমা করতে থাকে। 1984 সালের 24 সেপ্টেম্বর অকেজো হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত উপগ্রহটি থেকে বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় তোলা ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় 2500 ছবি পাওয়া গিয়েছিল।

18 **এপ্রিল** 1882, এইদিন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ চার্ল্‌স্ ডারউইনের মৃত্যু হয়।

18 **এপ্রিল** 1955, এইদিন বিখ্যাত পদার্থবিদ ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রণেতা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আমেরিকার (Princeton) শহরে পরলোক গমন করেন।

19 **এপ্রিল** 1971, এইদিন প্রথম মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র সোভিয়েত রাশিয়ার 'স্যালিউত্' (Salyut) কে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। ভূপৃষ্ঠের 200-222 কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে 12 মিটার লম্বা এবং 4 মিটার ব্যাসের বেলনাকার গবেষণা কেন্দ্রটি প্রায় ছ'মাস থাকে। সে সময়ের মধ্যে দু'দল মহাকাশ-যাত্রী 'সোয়ুজ' (Soyuz) যানে চড়ে কেন্দ্রটিতে পৌঁছে সেখানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। প্রথম তিনজনের দলটি 23 এপ্রিল কেন্দ্রটির কাছে পৌঁছয় কিন্তু যান্ত্রিক

গোলযোগের দরুন কেন্দ্রটির ভেতরে পৌঁছতে পারেনি। তাঁদের সোয়ুজ-10 যানটি মহাকাশ কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জুড়ে থাকার পর 24 এপ্রিল নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। দ্বিতীয় দলটিতেও তিনজন মহাকাশযাত্রী ছিলেন। 6 জুন কেন্দ্রটিতে পেঁছবার পর কেন্দ্রটিতে তাঁরা প্রায় 24 দিন সেখানে থাকেন এবং তারপর তাঁদের সোয়ুজ-11 যানে চড়ে পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু 30 জুন যানটি

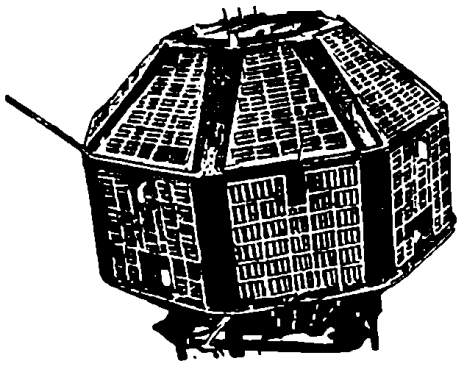

পৃথিবীতে নেমে আসার পর তিনজনকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে জানতে পারা যায় যে পৃথিবীতে নামার সময় যানটির একটি বিশেষ কপাটে ত্রুটি থাকার দরুনই যানের ভেতরের হাওয়া বেরিয়ে যায় এবং মহাকাশযাত্রিদের মৃত্যু হয়। 11 অক্টোবর 1971 মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষচ্যুত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

19 **এপ্রিল** 1975, এইদিন ভারতে তৈরি প্রথম আর্যভট্টকে একটি সোভিয়েত ইণ্টার কস্‌মস্ (Inter cosmos) রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়। 358 কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠের প্রায় 600 কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে প্রতি 96 4 মিনিটে একবার পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকে। উপগ্রহটির আনুমানিক কার্যকাল নির্ধারিত ছিল মাত্র এক বছর। কিন্তু সাত বছর বাদেও উপগ্রহটির যন্ত্রপাতি কার্যকরী অবস্থায় ছিল।

20 **এপ্রিল** 1940, এইদিন সর্বপ্রথম আমেরিকার আর সি এ (RCA) কোম্পানী জনসাধারণের সামনে একটি ইলেক্‌ট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope) প্রদর্শন করেন। ঐ ধরনের যন্ত্র অবশ্য গবেষণাগারে প্রথম তৈরি করেছিলেন জার্মানির দু'জন বিজ্ঞানী ম্যাক্সনল (Max knoll) এবং আর্নস্ট রুজকা (Ernst Ruska) 1931 সালে। যন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে এটি আলোর পরিবর্তে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের ইলেকট্রন তরঙ্গ ব্যবহার করে এবং তার ফলে ক্ষুদ্রতম বস্তুও বহুগুণ বড় করে দেখাতে পারে। ইলেকট্রন তরঙ্গকে ফোকাস করার জন্য কাঁচের লেন্সের পরিবর্তে এতে থাকে বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলী যার সাহায্যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। আধুনিক ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম ভাইরাস কণাকেও প্রায় দশ লক্ষ গুণ বড় করে দেখায়।

21 **এপ্রিল** 1972, অ্যাপোলো-16 চন্দ্রযানের দু'জন যাত্রী ইয়ং এবং ডিউক আজ চাঁদের মাটিতে নামেন।

24 **এপ্রিল** 1967, আজ উৎক্ষেপণের আগেই 'অ্যাপোলো-1' যানে আগুন লাগার ফলে তিনজন মহাকাশযাত্রী এডওয়ার্ড হোয়াইট (Edward White), গাস গ্রিসম (Gus Grissom) এবং রজার ক্যাফে (Roger Chaffe)'র মৃত্যু হয়। পরে জানতে পারা যায় যে যানের ভেতরের অক্সিজেন সমৃদ্ধ পরিবেশই ঐ অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ ছিল। পরবর্তী অ্যাপোলো-যানগুলিতে সেজন্য বিকল্প গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

26 **এপ্রিল** 1920, বিশ্ববিখ্যাত গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন আজ মাদ্রাজে পরলোক গমন করেন।

হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেণ্টার-এর বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত জানুয়ারী মাসের 22, 23, ও 24 তারিখে হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেণ্টার আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু স্কুল ভবনে। এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। 22শে জানুয়ারী এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়। এই উপলক্ষে হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেণ্টার এর পক্ষ থেকে সায়েন্স করেসপনডেণ্ট নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার এবং জিওলজি বিভাগে মডেল প্রদর্শনী দেখানো হয়। মডেলগুলি দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

টিকটিকিদের লেজ খসে যায় কেন ? এবং এরা সোজা দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে কেমন করে ?

টিকটিকিদের লেজটাতে প্যারেনকাইমা নামে একজাতীয় কোষের আধিক্য থাকে। এই জাতীয় কোষরা আবার কখনও সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করে না। একরকম আলতোভাবে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঠেকে থাকে। তাই লেজ ধরে ফেললে লেজ খসিয়ে দিয়ে টিকটিকিরা পালিয়ে যেতে পারে।

প্যারেনকাইমা কোষের আধিক্য কোন কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। হাইড্রা, প্লানেরিয়া, কেঁচো ইত্যাদির সারা গায়ে এবং টিকটিকিদের ঐ লেজের দিকটায় বেশি থাকে।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, প্যারেনকাইমা কোষগুলো দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ না হওয়ার জন্য দেহে অবস্থিত অন্য ধরনের পুনর্গঠন কোষ বা রিজেনারেশন সেল অক্লেশে ওদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে এবং কাটা অংকে জোড় লাগাতে পারে। তাই হাইড্রাদের দু'ফাঁক করে জোড়া লাগিয়ে দিলেও জোড়া লেগে যায় ও বেঁচে থাকে, প্লানেরিয়াদের মাথা কেটে দিলেও পুনর্বার মাথা গজায় এবং টিকটিকিদের লেজেই কেবলমাত্র অতিরিক্ত প্যারেনকাইমা কোষ থাকায় কেবলমাত্র ঐ লেজটাই পুনর্গঠিত হয়।

দ্বিতীয় অংশের উত্তরে বলতে হয় যে, টিকটিকিদের পায়ের পাতার গড়ন একটু আলাদা। খাড়া ও সমতল দেওয়ালের গায়ে পা ফেলে পা-কে একটু উপরের দিকে টেনে তুললে দেওয়াল ও পায়ের পাতার ফাঁকে বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাই আপনা হতেই তারা ঝুলে থাকতে পারে এবং খাড়াভাবে ওঠানামাও করতে পারে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

নক্ষত্ররা মিট মিট করে কেন ?

জানতে চেয়েছে, তপন কুমার ধাড়া চন্দ্রহাটি হুগলী থেকে।

প্রঃ হৃদরোগ কেন হয় ? কুন্তল রেজ, মন্তেশ্বর—বর্ধমান।

উঃ হৃদরোগ সাধারণত উচ্চ ও নিম্ন ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত রোগ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেহের ছোট ছোট ধমনী বা তার নালিকাগুলোর কোন কারণে পরিবর্তন হলে তাদের প্রসারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং সংকোচন বেশি হয়। এর ফলে রক্তপ্রবাহ চলতে থাকলেও সরু নালীগুলিতে চাপ বেশি হয় এবং রক্তপ্রবাহের বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের রোগ আসে। দ্বিতীয়তঃ "করোনারি আর্টারি" ও "ভেন"—যারা হার্টকে আর্টারি সরবরাহ করে তাদের মধ্যেও যদি কোন গোলমাল আসে তাহলে হার্টে ব্যথা আসবে এবং রোগ হবে। এর ফলে অনেক সময় করোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে। তৃতীয়ত হার্টের ভালবগুলোর কাজের গোলমাল হলেও হার্টের রোগ আসে।

উচ্চরোগে আক্রান্ত রোগীরা হৃৎপিণ্ডের জায়গায় প্রবল ব্যথা অনুভব করে, উঠতে বসতে কষ্ট অনুভব করে এমনকি অনেক সময় শ্বাস নিতেও কষ্ট অনুভব করে। এই অবস্থা হলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

প্রঃ ডেসিবেল কাকে বলে ? কার্তিক দত্ত। চণ্ডীপুর, তারাপীঠ, বীরভূম।

উঃ 'ডেসিবেল' শব্দের তীব্রতা প্রকাশের স্কেল। সাধারণত শব্দের তীব্রতা শব্দের চাপমাত্রা বা SPL দ্বারা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে নিম্ন কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ তথা 20 হার্ৎস কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ যা কেবলমাত্র আমাদের কানে ধরা পড়ে তার চাপমাত্রা 2×10^{-5} প্যাস্কাল। এই ভাবে হিসেব করতে গেলে শব্দের কম্পাঙ্ক যত বাড়বে ততই আমদানি হবে এক একটি জটিল সংখ্যা। সেই কারণে শব্দের তীব্রতাকে সহজভাবে প্রকাশ করতে ডেসিবেল স্কেলের প্রবর্তন করা হয়েছে। স্কেলটি টেলিফোন আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেলের নামানুসারে। কোন তীব্র শব্দের সঙ্গে প্রমাণ কোন তীব্রতার অনুপাত নেওয়া হয় এবং এই অনুপাতের লগ (log) গ্রহণ করলে হয়, "বেল"। বেলের এক দশমাংশই ডেসিবেল।

অতি মৃদু শব্দ যা আমাদের কাণের কাছে ধরা পড়ে মাত্র, তাকে ধরা হয় O ডেসিবেল। স্কেলটি এমনভাবে তৈরি যে, শব্দের চাপমাত্রা 10 গুণ বাড়লে ডেসিবেলে মাত্রা বাড়ে 20 গুণ। সেই হিসাবে একটি হাতঘড়ির শব্দ 25 ডেসিবেল।

প্রঃ পরিবাহীর অতিপরিবাহিতা কী? এর আবিষ্কর্তা কে এবং কীভাবে আবিষ্কার হয়েছে? অতিপরিবাহিতায় পরিবাহীর রোধ কী একেবারে শূন্য হয়ে যায়? যদি হয় তাহলে কেমন করে হয়? এর ব্যবহারিক গুরুত্ব কতখানি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন রেখেছো সত্যেন্দ্রনাথ বর্মণ, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে।

উঃ প্রশ্নগুলোকে একত্র করলে অতি পরিবাহিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে হয়। যা এই বিভাগের স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা খুবই মুস্কিল। তবু সংক্ষেপে এবং যথা-সম্ভব সহজ ভাবে বর্তমান শতাব্দীর এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারটি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা গেল।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো ধাতু, মাটি, জীবদেহ, গ্রাফাইট প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-সহজে চলাচল করতে পারে এবং, ঐ কারণে ওদের বলে পরিবাহী। তবে পরিবাহীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে গেলে কিছু না কিছু বাধা পায়। এই বাধা আবার পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সরু ও দীর্ঘ ধাতব তারে বাধা পায় বেশি এবং মোটা ও ছোট তারে বাধা কম। এই বাধাকে বলে রেজিস্ট্যান্স বা রোধ। তবে এও সত্য যে, যে যত উত্তম পরিবাহী হোক না কেন এবং যত মোটা ও খাটো দৈর্ঘ্যের হোক না কেন, রোধ কিছু না কিছু থাকেই।

কামেরলিং ওন্‌নেস নামে হল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী পরিবাহীর রোধকে উপেক্ষা করা যায় কিনা—এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা চালান। একটি উত্তম পরিবাহী পারদকে নিয়ে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পরীক্ষা করতে করতে একদিন সন্ধান পেলেন পারদের তাপমাত্রা 4·2 ডিগ্রী কেলভিনের তলায় থাকলে তড়িৎ প্রবাহে কোন বাধা প্রদান করে না বা যতটুকু বাধা প্রদান করে তাকে সহজে উপেক্ষা করা চলে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। এতে খুব আশ্চর্য বোধও করেছিলেন সবাই এবং অনেকেই সেই পরীক্ষাটি হাতেনাতে করে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর অন্য কোন ধাতুর মধ্যে অনুরূপ গুণ আছে কিনা সন্ধানও করে-ছিলেন। দু একটি ধাতুর সন্ধানও পেয়েছিলেন। তবে বুঝতে পেরেছিলেন, যারাই এই গুণ লাভ করে তারা সবাই একেবারে নিম্ন তাপমাত্রায়।

বিজ্ঞানীরা সেদিন নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহীর ঐ গুণের জন্য নাম রেখেছিলেন অতিপরিবাহিতা বা সুপার কনডাক-টিভিটি। কিন্তু, কারণটি কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেননি, বা এর কোন ব্যবহারিক দিক আছে কিনা সে বিষয়েও ভাবনা চিন্তা করেন নি। এক রকম অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত। যদিও কামেরলিং ওন্‌নেসকে ঐ আবিষ্কারটির জন্য প্রদান করা হয়েছিল নোবেল পুরস্কার।

বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব উন্নতি হতে শুরু করে। বিশেষতঃ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে প্রায় সর্বক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, প্রবাহমাত্রা বাড়াতে গেলে রোধের জন্যই বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজ বাড়াতে হচ্ছে। তখনই তাঁদের চিন্তা আসে, যদি রোধহীন কোন পরিবাহী পাওয়া যায় তাহলে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভোল্টেজ যেমন বাড়ানো যাবে, তেমনই পরিবাহী উত্তপ্তও হতে পারবে না। অনেক সুবিধা হবে কাজে।

খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়ে ওন্‌নেসের সেই পরীক্ষাটির উপর। নিম্ন তাপমাত্রায় পারদ ছাড়া আরও দু-একটি ধাতুকে তাঁরাও আবিষ্কার করলেন। কোন ক্ষেত্রে রোধ যদিও একেবারে O নয়, তবু এত কমলে তাকে একরকম উপেক্ষাই করা যায় এবং নিম্ন তাপমাত্রায় অতি-পরিবাহিতা গুণ কেন ওরা লাভ করে তার জন্য বেশ তোড়-জোড় শুরু হয়ে যায়। অবশেষে বার্ডিন ও ফ্রোহলিশ নামে দু-জন বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম থিওরী অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলেন, নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতব কেলাসগুলো পরস্পর সংবদ্ধ হয় এবং তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে কম্পন জাগে তাতে এক একটি শক্তি কণিকা বা ফোটন নির্গত হয় বলে অতি-পরিবাহিতা গুণ প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত মতবাদকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে মেনে নিলেও গবেষণা চলতে থাকে। শেষে ঐ বার্ডিনই নিজের মতবাদে নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। তারপর বার্ডিন এবং তাঁর দুই সহযোগী কুপার ও শ্রিফার ১৯৫৬ সালে আর এক তত্ত্ব খাড়া করলেন। আবিষ্কারকদের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে তত্ত্ব-টির নামকরণ করা হয়েছে বি. সি. এস তত্ত্ব। উক্ত তত্ত্ব অনুযায়ী তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে পরিবাহীকে বিশেষ একটি নিম্ন তাপমাত্রায় আনলে যখন সে অতি পরিবাহিতার গুণ প্রাপ্ত হয় তখন তার ইলেকট্রন জোড়গুলো লেসারের [LASER] মত সুসংহত ও সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় ধাতব কেলাসের কম্পনশক্তি তাকে আর বাধা প্রদান করতে পারে না, বা এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে না। ফলে বিদ্যুৎ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কেবল এগিয়েই যায়। আর এই অবস্থায় পরিবাহী কোনপ্রকার রোধ সৃষ্টি করতে পারে না।

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার **প্রথম পাঠ**
সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী
জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত
নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ণ** ১২
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫
মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০
ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮
সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন
জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ **ছোটদের কাজল** ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL12

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১০ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম ঃ 4·00 টাকা।